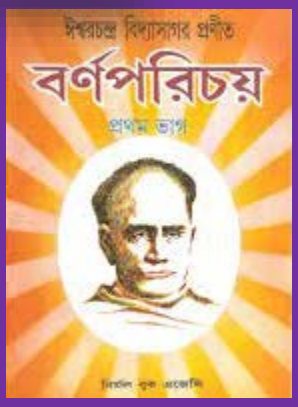

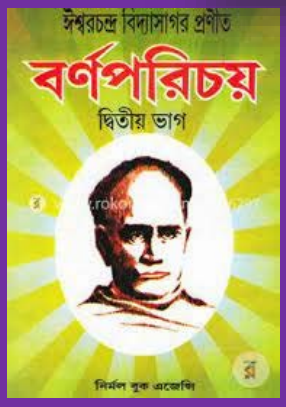

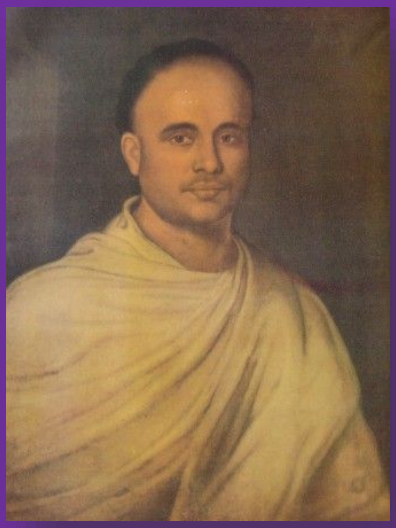

প্রবাস বন্ধু

বিশেষ সংখ্যা ১৪২৮ (2021)

স্বাধীনতা কেউ দেয় না, অর্জন করে নিতে হয়।

- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

"আমি দেশাচারের নিত্যান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।"

--ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

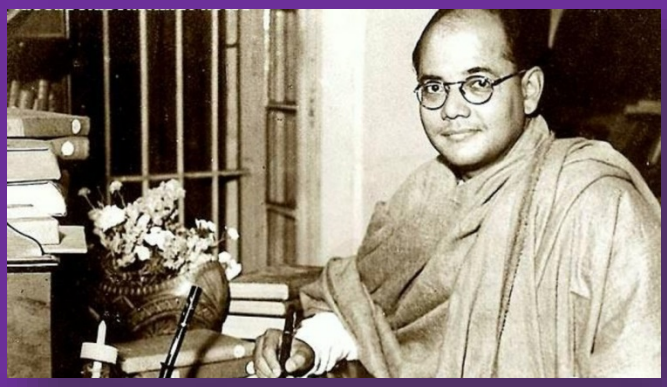

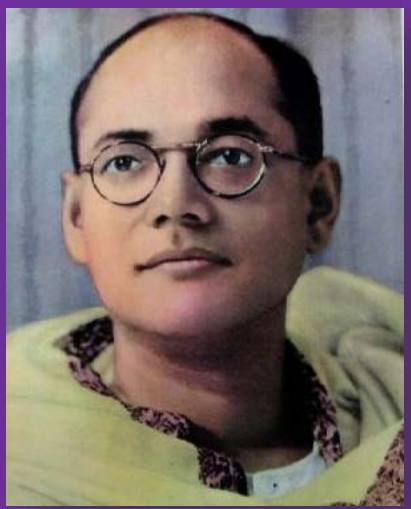

১৪২৮ : প্রবাস বন্ধু : বিশেষ সংখ্যা : বিষয় তালিকা : 2021

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস)	6
আমার ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর	যশোধরা রায়চৌধুরী (কলকাতা, ভারত)	7
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি সাক্ষাৎকার	সাগরিকা বিশ্বাস (কলকাতা, ভারত)	12
রেঙ্কোজির খোঁজে	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	15
বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত কলেজের নব রূপায়ক	অদিতি ঘোষদস্তিদার (মরিস প্লেইনস্, নিউ জার্সি)	22
মহানিষ্ক্রমণ	সংগ্রামী লাহিড়ী (পারসিপ্যানি, নিউ জার্সি)	26
মনসঙ্গীত ১, মনসঙ্গীত ২	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	30
ভুল নামে ডাকি, একটি স্বপ্নের নাম	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	31
লেখক ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর	বেবী কারফরমা (কলকাতা, ভারত)	33
বিদ্যাসাগর মুসলমান পল্লী ও ফকিরের গান	শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	37
দীনের সদা বন্ধু যে জন বন্ধুতার প্রতীক বিদ্যাসাগর	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	43

প্রবাস বন্ধু
বিশেষ সংখ্যা

জৈষ্ঠ্য ১৪২৮, মে ২০২১
প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ ও শেষ পাতা
ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

রিভিউ
চন্দ্রা দে
রূপছন্দা ঘোষ

জনসংযোগ
সুমিতা বসু
সফিক আহমেদ

সম্পাদনা
মালবিকা চ্যাটার্জী

সহযোগিতায়
ঋত্বিক চ্যাটার্জী

ছবি ও কিছু তথ্য ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম:	২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ বীরসিংহ গ্রাম, হুগলি জেলা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত (অধুনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়)
মৃত্যু:	২৯ জুলাই ১৮৯১ (বয়স ৭০) কলকাতা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত (অধুনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে)
ছদ্মনাম:	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য, কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য
পেশা:	লেখক, দার্শনিক, পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, প্রকাশক, সংস্কারক, মানবহিতৈষী
ভাষা:	বাংলা ও সংস্কৃত
জাতীয়তা:	ব্রিটিশ ভারতীয়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:	সংস্কৃত কলেজ (১৮২৮-১৮৩৯)
সাহিত্য আন্দোলন:	বাংলার নবজাগরণ
উল্লেখযোগ্য রচনাবলী:	বর্ণপরিচয় , কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী ব্যাকরণ কৌমুদী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (২খণ্ডে), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (২ খণ্ডে), অতি অল্প হইল (১৮৭৩), আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪),
দাম্পত্য সঙ্গী:	দীনময়ী দেবী
সন্তান:	নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পিতা:	ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মাতা:	ভগবতী দেবী
সেজ ভ্রাতা:	শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

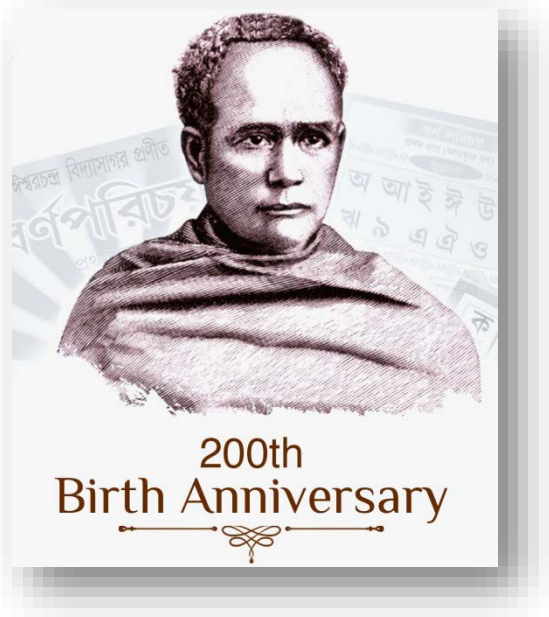

সুভাষচন্দ্র বসু

জন্ম:	২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭
	কটক, ওড়িশা বিভাগ, বেঙ্গল প্রদেশ, ব্রিটিশ ভারত কটক, (অধুনা কটক, ওড়িশা রাজ্য)
মৃত্যু:	অমীমাংসিত (তবে, ১৫ অগাস্ট ১৯৪৫, ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত)
নাগরিকত্ব:	ব্রিটিশ ভারতীয়
জাতীয়তা:	ভারতীয়
রাজনৈতিক দল:	ফরওয়ার্ড ব্লক
অন্যান্য রাজনৈতিক দল:	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
দাম্পত্য সঙ্গী বা সহচর:	এমিলি শেঙ্কল
	(সুভাষচন্দ্র বসু দ্বারা প্রকাশ্যে অস্বীকৃত,
	কোনও অনুষ্ঠান বা সাক্ষী ছাড়াই ১৯৩৭ সালে গোপনে বিবাহ)
সন্তান:	অনিতা বসু পাফ
মাতা:	প্রভাবতী দত্ত
পিতা:	জানকীনাথ বসু
আত্মীয়স্বজন	বসু পরিবার
বাসস্থান:	৩৮/২ এলগিন রোড, (অধুনা লালা লাজপত রাই সরণি), কলকাতা
শিক্ষা:	ব্যাপটিস্ট মিশন'স প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয় স্কুল, কটক, ১৯০২–০৯
	র‍্যাভেনশো কলেজিয়েট স্কুল, কটক, ১৯০৯–১২
	প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, ১৯১২–১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬
	স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, ২০ জুলাই ১৯১৭–১৯১৯
	ফিটজউইলিয়াম হল, নন-কলেজিয়েট স্টুডেন্টস্ বোর্ড, কেমব্রিজ, ১৯১৯-২২
প্রাক্তন শিক্ষার্থী:	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বি.এ., দর্শন, ১৯১৯)
	কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (বি.এ. মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান ত্রিপোস, ১৯২১)
যে জন্য পরিচিত:	ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী
	আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠক ও সর্বাধিনায়ক

সম্পাদকীয়

"প্রবাস বন্ধু"-র এই বিশেষ সংখ্যা যে দুই মানুষের জন্য আমরা উৎসর্গ করছি, তাঁরা দুজনেই ভারতের এবং বলা বাহুল্য বাংলার গর্ব। বাংলায় এবং সারা ভারতে বহু মনীষী আছেন যাঁরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আমাদের ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেছেন; সকলের প্রতিই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

এই সংখ্যায় যাঁদের প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করছি, সম্প্রতি সেই দুই যুগান্তকারী মহামানবের বিশেষ জন্মবর্ষ পূর্ণ হ'ল। শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে; গত বছরে তাঁর জন্মের ২০০ বছর পূর্ণ হ'ল। আর শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৩শে জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে; এই বছরে ২৩শে জানুয়ারি তাঁর ১২৪তম জন্মবর্ষ উদযাপিত হয়েছে। আগামী জানুয়ারিতে তাঁর ১২৫তম জন্মপূর্তি।

একটা জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কিছু মানুষের অপরিসীম কৃচ্ছ্রসাধনের দৃষ্টান্ত আমরা সততই দেখতে পাই। বিদ্যাসাগর ও নেতাজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ভারত আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গা এত মজবুত হতে পারত কিনা বলা মুশকিল যদি না বিদ্যাসাগর তাঁর মনপ্রাণ দিয়ে ভারতের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতেন, নারীর প্রতি সমাজের অবিবেচিত আচরণ রোধ না করতেন, নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নানাবিধ সংস্কারের জালে জড়িয়ে ফেলার মতো নৃশংস অত্যাচারের কবল থেকে বের করে না আনতেন।

তাঁর মেধা ও জ্ঞান ছিল অপরিমেয়। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। ছোটবেলা থেকে বহু বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েও জ্ঞান আহরণের ইচ্ছে থেকে সরে থাকতে পারেননি। আর্থিক কারণে বাড়িতে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তায় গ্যাসবাতির আলোতে লেখাপড়া করেন। সেখান থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যান তাঁর জীবনের সাফল্যের দিকে। বৃত্তি পান তাঁর মেধার জন্য। জোড়াসাঁকোতে শিক্ষকতার একটি কাজ নেন নিজের পরিবার পালন করবার জন্য। কতটুকুই বা বয়স তখন তাঁর! সত্যিই বিদ্যার সাগর ছিলেন তিনি। মাত্র ২১ বছর বয়সে বেদান্ত, সংস্কৃত এবং বাংলায় তাঁর পান্ডিত্য মানুষের নজর কাড়ে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর ১৩০ বছর পরে, এ যুগেও বাঙালির শিশুকাল থেকে বাংলা বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিদ্যাসাগরের "বর্ণপরিচয়" বইয়ের সাহায্যে।

বিদ্যাসাগর যে যুগে জন্মেছিলেন এবং জীবন ধারণ করেছিলেন সে যুগটা ভীষণ রকম গোঁড়ামির বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। ধর্ম ও সংস্কারের দোহাই দিয়ে তৎকালীন ব্রাহ্মণরা যা নয় তাই করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। বিদ্যাসাগর এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই ভাবধারায় বড় হয়ে উঠেও ব্রাহ্মণত্বের দম্ভে আপ্লুত হতে পারেননি; বরং তিনি প্রতিনিয়ত সেসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বারে বারে আঙুল তুলেছেন সমাজের কলুষতার দিকে, বোঝাতে চেষ্টা করেছেন মানুষের অগ্রগতির জন্য সেসব আচরণ কতখানি প্রতিবন্ধক। একবার কোথাও একটা উক্তি চোখে পড়েছিল, যার সারমর্ম হ'ল –
স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ভারতবর্ষকে উদ্ভাসিত করেছিলেন বিদেশের কাছে। আর বিদ্যাসাগর বিদেশকে পরিচিত করেছিলেন ভারতের কাছে।

স্বামীজীর জন্মের ৪৩ বছর আগে জন্মেছিলেন বিদ্যাসাগর। একেবারে তৎকালীন প্রচলিত ব্রাহ্মণ পরিধান, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মানোয় মাথায় টিকি, পায়ে খড়ম ইত্যাদি বজায় রেখে একজন মানুষের অত বছর আগে এতখানি উন্মুক্ত এবং আধুনিক চিন্তাধারা কল্পনা করা যায় না। তাঁর স্বভাবে ছিল যথাযথ দেশী বিদেশী ভাবধারার সংমিশ্রণ। বিদেশী সভ্যতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেখান থেকে বেছে নিতে চেয়েছিলেন ভালটুকু। বুঝেছিলেন শিক্ষা কতখানি প্রয়োজনীয় একটা সুগঠিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য। এমনকি নারী-শিক্ষাও। অতদিন আগে তিনি ভেবেছিলেন এ সমস্ত – তাঁর স্বপ্ন কি আজকের ভারত সম্পূর্ণরূপে সফল করে তুলতে পেরেছে? তাঁর জেদী মনোভাবের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে – বন্ধ করেছিলেন বাল্যবিবাহ, প্রচলন করেছিলেন বিধবা বিবাহ, নারীশিক্ষা। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছিলেন শহরে ও তার আশেপাশে। বাংলার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে, বন্ধ

করেছিলেন বহুবিবাহ | গোটা মানব জাতি যে সমান অধিকারে অধিকারী – এমন ভাবনা তখন কেউ ভাবতেও পারতেন না এবং যাঁরা বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় তেমনটা ভাবতেন তাঁদের সমাজের কাছ থেকে নির্যাতন সইতে হয়েছে|
তাঁকে আমরা কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর রূপেই জানি না, তাঁকে করুণাসাগর বললেও কম বলা হবে| দরিদ্র, নিরুপায়, অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর দয়া, করুণা ও দাক্ষিণ্যের হাত সর্বদা বাড়ানো ছিল|

নেতাজী জন্মেছিলেন বিদ্যাসাগরের জন্মের অনেক পরে| ৭৭ বছর পরে| বিদ্যাসাগরের তখন দেহান্তও হয়ে গেছে| এক বংশে না জন্মালেও তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, চারিত্রিক গঠনের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়| নেতাজীর পারিবারিক অবস্থা অবশ্য স্বচ্ছল ছিল | সে সময় কোনও ভারতীয় ব্রিটিশরাজের বিপক্ষে গেলে জোরদার অত্যাচার চলত তাদের ওপর| শিশু সুভাষের মনেও সেসব অত্যাচার গভীর রেখাপাত করত| স্থির থাকতে পারতেন না যতক্ষণ তার বিহিত হচ্ছে| এমন শিশু সচরাচর দেখা যায় না| তাঁরা আসেন অতিমানবিকতার দায়িত্ব পালন করতে| জগতের চোখ খুলে দেন তাঁদের কর্মকান্ডের দ্বারা|

সুভাষের দেশপ্রেমের নজির আমরা পাই তাঁর বাল্যকাল থেকেই| কটকের র‍্যাভেনশো কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন তাঁর দেশসেবার অনেক নমুনা পাওয়া যায়| সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর পিতা নবম সন্তান নেরমাতার চৌদ্দ সন্তা| বড়-ছোট অনেক ভাইবোনদের মধ্যে সুভাষ ছিলেন অত্যন্ত স্নেহধন্য| তাঁর মেজদাদা, শরৎচন্দ্র বোস একজন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ এবং দেশপ্রেমী মানুষ ছিলেন এবং সেই দাদা ও বৌদি দুজনেই সুভাষকে আর্থিক ও মানসিকভাবে সমর্থন করে বার বার পাশে দাঁড়িয়েছেন| পরে এসেছেন তাঁর ভাইপো, ভাইঝি – যাঁরা কাকার (নেতাজী) সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করেছেন তাঁর এলগিন রোডের বাড়ি থেকে শেষ বিদায় নেওয়া পর্যন্ত|

তাঁকে সারাজীবন ব্রিটিশদের সঙ্গে মোকাবিলা করে কাটাতে হয়েছে| দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে সুভাষ তাঁর নিজস্ব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ফিরেও তাকাননি| বার বার দেশের টানে, পথের টানে বেরিয়ে পড়েছেন| নিজের জীবন সুন্দরভাবে গুছিয়ে নেবার জন্য সম্পদের অভাব ছিল না সুভাষের মধ্যে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একেবারে বিপরীত| যথেষ্ট মেধাবী না হলে এত কিছুর মধ্যেও তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাবর সফল হতে পারতেন না| স্কুল পাস করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকলেন| সেখানে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের জন্য তাঁকে সেই কলেজ ছেড়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ঢুকতে হয়| তিনি স্কটিশ চার্চেরই স্নাতক (১৯১৯ সাল)| তারপরে তাঁকে তাঁর বাবা-মা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতির জন্য ইংল্যান্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন| ১৯২০ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে জাতীয়তাবাদী অশান্তির কথা শুনে সবকিছু ত্যাগ করে দ্রুত ভারতে ফিরে যান|

তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল| শুধু জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের কাছে, কারণ সুভাষের ফন্দিফিকির তারা আন্দাজই করতে পারত না! আর সুভাষ যে নিজের দেশের মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার একেবারে বরদাস্ত করতেন না! কতবার যে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করেছে তার ঠিক নেই, কিন্তু সুভাষের জনপ্রিয়তা কোথাও কোন অংশে ম্লান হয়নি| কুড়ি বছরের মধ্যে সুভাষচন্দ্র মোট ১১ বার গ্রেফতার হয়েছিলেন| সেই রকমই এক অবস্থায় তিনি কলকাতার মেয়র পদে নির্বাচিত হন| তার পরেও গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সন্দেহে তাঁকে কারাবাস করতে হয়|

তিনি কলকাতায় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা হয়েছিলেন| সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শক্তি| তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে কারো কোনও দ্বিমত ছিল না| তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন| কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস সংগঠনে থেকে বুঝেছিলেন এভাবে স্বাধীনতা পাওয়া সহজ হবে না; এই কারণে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন| তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই অপরাধে তাঁকে আবারও কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল| দেশের এইরকম একটা সময়ে তিনি কারাবন্দী হয়ে থাকতে চাননি, প্রতিবাদ-স্বরূপ শুরু করেন অনশন| এত জনপ্রিয় এক নেতার এই অবস্থা দেশবাসী মেনে নেবে না আশঙ্কা করে ব্রিটিশরাজ তাঁকে

মুক্তি দেয় ঠিকই কিন্তু নজরবন্দী রাখে। এইভাবে কারাবন্দী, নজরবন্দী সব এড়িয়ে তিনি ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে ২৬শে জানুয়ারি ১৯৪১ সালে ছদ্মবেশে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান ভাইপো ভাইঝিদের সহযোগিতায়।

তারপর নানা দেশে ঘুরে, নানা নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে শেষে জাপানের আর্থিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তায় গড়ে তোলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সেনাবাহিনী। সামরিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন বজায় রাখতে সক্ষম হন। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুলাই, বর্মায় ভারতীয়দের এক সমাবেশে আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর জন্য একটি ভাষণ প্রদানের সময় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তিটি উচ্চারিত হয়: "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব!" এর মাধ্যমে তিনি ভারতের জনগণকে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। নেতাজীর জীবনের অনেকটাই রহস্যাবৃত। দেশ স্বাধীন করার কাজের জন্য বহু ক্ষেত্রে তাঁর নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা এবং তাঁর কার্যকলাপ গোপন রাখা প্রয়োজন ছিল । তাঁর মৃত্যু নিয়েও সংশয় রয়ে গেছে; যদিও বলা হয় যে তিনি তাইওয়ানে এক প্লেন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে টাইপে-তে জাপানি হাসপাতালে মারা যান।

এই দুই মনীষীর জীবনবৃত্তান্ত সামান্য কথায় সারা যায় না। তাঁদের জীবনের বৃহৎ কর্মকান্ড আজও আমাদের জীবনে ছায়াপাত করে।

ওই সময় বিদ্যাসাগরের জনসেবা আর অনাচার বন্ধ করার জিদ যদি না থাকত তাহলে আরো কত যুগ লাগত সবকিছু ন্যায়সঙ্গত হতে!

আর নেতাজী যদি নেতার মতো সাহস আর মনোবল নিয়ে দেশকে স্বাধীন করার ব্রতে ব্রতী না হতেন তাহলে ভারতের মানচিত্র বদলাতে আরো অনেক সময় লেগে যেত।

বিদ্যাসাগর ও নেতাজীর অবদান অশেষ। যতদিন আমরা স্বাধীন ভারত দেখব, যতদিন আমরা ভারতে সুশিক্ষার বিকাশ দেখব, ভারতের নারীদের উন্নত মান দেখব, ততদিন আমরা নেতাজী আর বিদ্যাসাগরের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

মালবিকা চ্যাটার্জী

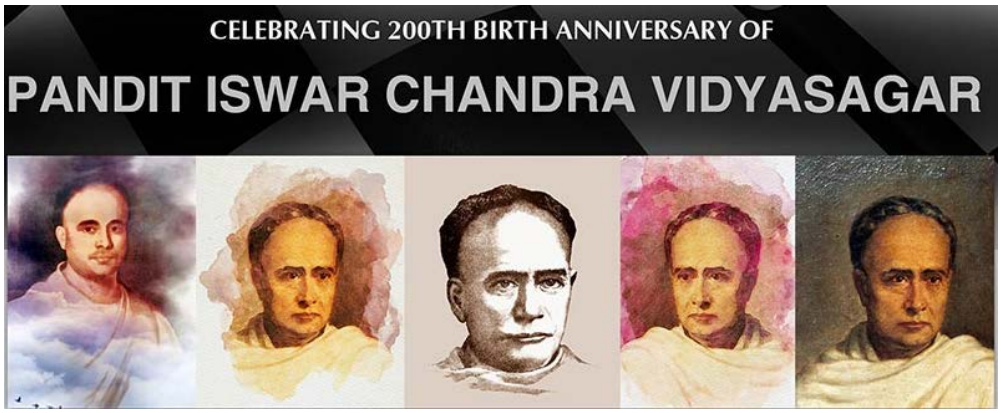

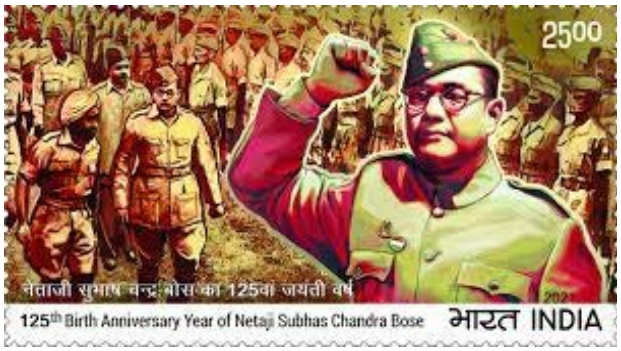

আমার ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর

যশোধরা রায়চৌধুরী

বিজ্ঞানীদের গল্প পড়তে ছোটবেলায় খুব ভাল লাগত | সে যেন এক রূপকথার গল্প পড়ছি | এভাবেই জেনেছিলাম কোপারনিকাসের কথা, জোহানেস কেপলারের কথাও | যখন শৈশবে ভূগোল বইতে পড়েছিলাম সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে – ভূগোলের বইতে পড়া এই চরম চূড়ান্ত সত্য একদা গোটা পৃথিবীর লোকের কাছে অবিশ্বাস্য ছিল, এ কথা ভাবতে শিখতে আরো কিছু সময় গেল | আরেকটু বড় হয়ে যখন পড়লাম ইউরোপে গির্জা ও ধর্মগুরুদের বিশ্বাস অনুযায়ী সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, মনে হ'ল, হ্যাঁ, আমাদের সাধারণ অশিক্ষিত মানসেও সেটা সেরকমই প্রতিভাত হয় তো | সকাল থেকে বিকেল সূর্যকেই আমরা আমাদের পুব থেকে পশ্চিমে প্রদক্ষিণরত দেখি | কিন্তু এই চিন্তা যে অবৈজ্ঞানিক, বরং পৃথিবীই সূর্যের চারিধারে ঘোরে এই কথা কে আমাদের শেখাল? কে ভূগোল আর বিজ্ঞান বইতে লিখল উল্টোটা?

এই অংক কষে প্রমাণ করার কাজ যাঁদের তাঁরাই তো সেইসব প্রাতঃস্মরণীয় | কথাটা শুধু অংক কষে জানলেই তো হবে না, তা বিশ্বসমক্ষে বলতে হবে, এবং জনে জনে বলে বিশ্বাস করাতে হবে | গির্জা ও রাজার কাছে বলতে প্রাণ বাজি রাখতে হবে | লড়াইটা অসম ও ভয়াবহ | তবু সত্যের জয় হয়েছিল একদা, প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সত্যটা | সেভাবেই লড়তে হয়েছিল কোপারনিকাসকে, গ্যালিলিও গ্যালিলিকে যুঝতে হয়েছিল ১৬১৫ থেকে ১৬৩৩ রোমান ইনকুইজিশনের সঙ্গে | তাঁকে গৃহবন্দী রাখা হয়েছিল ঈশ্বর ও গির্জাকে অস্বীকার বা হ্যারাসের দায়ে | কেপলারও তাঁর আবিষ্কারগুলিকে কাহিনীর মোড়কে লুকিয়ে পেশ করেন, তবু তাঁর মাকে গির্জার মাতব্বরেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাইনি সন্দেহে বিচারের জন্য | ইনকুইসিশনের যুগে বিজ্ঞানীদের শহিদ হয়ে যাওয়া, ঈশ্বর ও শয়তানের বাইরে গিয়ে পৃথিবীর ঘটনাবলীর অন্য ব্যাখ্যা দেবার দুঃসাহস করা, এই কাহিনীগুলো শুনলেই আমার আজও মনে হয়, কী হতো যদি তাঁরা ভয় পেতেন, যদি চুপ করে থাকতেন? সেই সৎ সাহস যদি তাঁদের না থাকত? ঠিক এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি আমাদের এই পোড়া বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎদের বিষয়ে হয় | রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিষয়ে বলেছিলেন, "দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে"|

আমি প্রায়ই ভাবি আমরা কত সৌভাগ্যবান যে আমরা বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বাংলায় জন্মেছিলাম | মেয়ে হয়ে জন্মেছিলাম এমন এক পরিবেশে যখন কোন বাধা ছিল না কোথাও, যা আমাদের মা অথবা দিদিমাদের সহ্য করতে হয়েছিল | হাজার বছর ধরে মেয়েদের যে অবস্থাকে নির্বিচারে বিনা যুক্তিতে একেবারেই বিধির বিধান বলে মেনে নিয়েছিল সমাজ, কি পুরুষ কি নারী বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রশ্নে | পুরুষ যদি বা নিজের সুবিধার্থেই নারীর এই অধীনস্থ, গৃহবন্দী, সহায়িকা-সেবাদাত্রী রূপকেই একমাত্র রূপ হিসেবে মেনে নিয়ে থাকে, মেয়েরাও এটাকেই বিধির বিধান মেনেছিলেন | এও তো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করার মতোই যেন স্বতঃসিদ্ধ এক ভাবনারই মতো!

কী অদম্য সাহস আর মনোবল ছিল বলেই না ইংরেজিতে শিক্ষিত নব্য এই ভারতীয়টি সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অধিকারী হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই কু-আচারগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পেরেছিলেন | শুধু মেয়েদের প্রতিই নয়, চতুর্বর্ণাশ্রমে বর্ণিত নীচ জাতি, গরিব মানুষের প্রতিও, যে কোন অনাচার, নির্দয়তা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে অগ্রণী ছিলেন এই দৃঢ়চেতা | 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে ইন্দ্রমিত্র ছত্রে ছত্রে দেখিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের এই দার্ঢ্য | নিজের গ্রাম, বীরসিংহে বাংলার অন্নাভাবের সময়ে তিনি অন্নছত্র করেছিলেন, অন্নছত্রে আসা মানুষগুলির মধ্যে মেয়েদের রুক্ষ চুল দেখে তাদের দু'পলা তেল দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন | যারা তেল বিলি করে তারা দূর থেকে তেল দেয় দেখে নিজে হাতে গরিব মেয়েদের মাথায় তেল মাখিয়ে দিতেও উদ্যত হয়েছিলেন | আবারও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আসি | "এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে – কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত

ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।"

বিদ্যাসাগর বস্তুত মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী। তিনি নারীবাদী কিনা, এ প্রশ্নের সুরাহা এই দুই উত্তরেই হয়ে যায়। যিনি মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী, তিনিই আসলে লিঙ্গে লিঙ্গে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে বিভেদের কোন মূল খুঁজে পাবেন না।

কী সর্বনাশটাই না হতো, যদি বিদ্যাসাগর না আসতেন বাংলার রঙ্গমঞ্চে? যদি তাঁর মতো এক সাহসী, দুর্দম মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে ইংরেজি ভাষার জ্ঞান ও সংস্কৃতের পান্ডিত্য এবং এক তীক্ষ্ণ যুক্তিশীল বিচারকামী মন বিরাজ না করত কখনো? মেনে নিলাম সেই নবজাগরণ সময়টির দান তিনি, যে সময় যুগ সঞ্চিত প্রাচীন সংস্কৃতি প্রশ্নের মুখে পড়ছে, কারণ বিদেশী শাসকের হাতে নব্য শিক্ষিত হয়ে উঠছে ভারতীয়রা। কিন্তু তবু, আরো হাজারজন ইংরেজি শিক্ষিত তো ছিলেন যাঁদের মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। যাঁরা মুখ বুজে কেরানিগিরি করে কলুর বলদ হয়ে থাকতে পেরেছিলেন।

সত্যি, যদি আমরা এতটাই দুর্ভাগা হতাম যে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে প্রাচীন পুঁথি-পুরা-শাস্ত্র পড়ে পড়ে দেখে তিনি প্রশ্ন না তুলতেন? ঠিক যেমন, আরেক নবজাগরণের নব দূত, রামমোহন রায়। এঁরা যদি না আসতেন এই ধরাধামে, কী হতো আমাদের, ভেবে বুক কেঁপে ওঠে। আমরা বাংলার মেয়েরা সারা ভারতের মেয়েদের চেয়ে আগে অন্তত যেটুকু আলো দেখতে পেয়েছিলাম সে আলোটাই হতো উধাও। অথবা পেছিয়ে যেত একশো দুশো বছর।

২

কেমন ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস? কর্মই ছিল তাঁর কাছে ধর্ম। ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন অথবা অজ্ঞেয়বাদী। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন এবং আচার অনুষ্ঠান নিয়ে তাঁর মতামত জানলে আজ শুধু আশ্চর্য হই না, মাথা নুয়ে আসে আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারি আমরা এখন পিছিয়ে যাচ্ছি আবার, অনেকটাই। মনে রাখতে হবে, যে সময়ের কথা আমরা বলছি, সেই সময়টাকে। ১৮২০-তে জন্ম যাঁর, তিনি বলছেন এক হিন্দুধর্ম প্রচারক পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে, "আপনাকে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য যাঁরা এনেছেন তাঁরা যে কেমন দরের হিন্দু তা তো আমি বেশই জানি, তবে আপনি এসেছেন, বক্তৃতা করুন। লোকে বলবে, বেশ বলেন ভাল।... আমার স্কুলের ছেলেরা যে মুরগীর মাংস খায়, আপনার বক্তৃতায় তারা যে মাংস ছাড়বে আমি তা একেবারেই বিশ্বাস করি না।" আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এ কথা অবিশ্বাস্য তবু বিদ্যাসাগর বলেছিলেন। তাঁর দর্শনের পন্ডিত তাঁকে বলেছিলেন, "ঈশ্বর বোঝো তো?" বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেছিলেন, "আপনি যেমন বোঝেন, আমিও তেমনি বুঝি, পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান।" বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "আমার কথা শুনে পন্ডিতমশায় খুব হাসতেন।" এই রসবোধ প্রজ্ঞার সঙ্গে যৌক্তিক বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব বিচারকে আজকের দিনে যেন সময়ের চেয়ে ঢের বেশি এগিয়ে থাকা মনে হয়।

তিনি বলতেন, "যেটা পারবি সেইটে কর।" এই ছিল তাঁর ধর্মভাবনা। বলতেন, "দুনিয়ার মালিক যদি অনন্ত দয়ালু হতো তো এত কষ্ট সংসারে থাকত?"

ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি নিজে আচার অনুষ্ঠান করতেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা না করলেও, তিনি অন্যের কোন সন্ধ্যা আহ্নিক দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন না। বিদ্যাসাগরের কাছে কাজ আর বিদ্যাচর্চার বাইরে কোন অন্য ধর্ম ছিল বলে মনে হয় না। তাই বোধহয় তিনি কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেন বিলেত থেকে আনা একমাপে এক চামড়ায় বাঁধাই করা সোনার জলে নাম লেখা বই। সেটাই ছিল তাঁর শখ, প্যাশনও। সবাইকে বই দেখাতেন। কিন্তু কেউ বই ধার চাইলে তিনি দিতেন না। নতুন একটি বই কেনার টাকা দিয়ে দিতে পর্যন্ত রাজি ছিলেন; কিন্তু কেউ বই চেয়ে নিয়ে যদি না ফেরায়, তাই প্রাণের চেয়ে প্রিয় বইগুলি কাউকে দিতেন না।

মৃত্যুশয্যায় শেষ দিনে তার পুত্র তাঁকে কী কষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জন্য চাকুরি জীবন অন্তে গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না।"

দিশী, পাদ্রি, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্ম, সকলের সঙ্গেই ঠাট্টা করেছেন বিদ্যাসাগর, কারণ জীবনে যুক্তিই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। একজন সত্যিকার স্বাধীন-চিন্তক, ট্রু লিবারাল, আড়ষ্টতাহীন বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্তরে বাহিরে ঝরঝরে মানুষ। ইন্দ্র মিত্রের লেখা যখন পড়ি, অসাধারণ বন্ধুবৎসল,

হাসিখুশি আড্ডাবাজ এক বিদ্যাসাগরের ছবি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে যায়, যিনি নিজের বাড়িতে লোককে নেমন্তন্ন করতে ভালবাসতেন, কেউ এলে তাকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্তত খাওয়াতেন। আশ্চর্য আমুদে, লোকের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করা, পোশাকের সাধারণত্বের গল্প তো অনেক, তাঁকে দেখে একজন অধ্যাপক বলেই চিনতে পারত না চাকর বা রাস্তার লোকেরা। এই ধরনের বহু কাহিনী চালু আছে তাঁর বিষয়ে। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ হরানন্দ থেকে উপবীত ত্যাগ করে একঘরে হয়ে যাওয়া রামতনু লাহিড়ী, বন্ধুত্বের ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের গভীর ঔদার্য ও সাহায্য থেকে কেউই বঞ্চিত হননি।

বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর সম্বন্ধে যত জানি তত শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে, আর বোঝা যায় বিদ্যাসাগর কীভাবে এই ধাতুতে গড়া। একবার বিদ্যাসাগর তাঁর মাকে বছরে একবার ঘটা করে পুজো করে ছ-সাতশো টাকা খরচ করার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মা উত্তর দিয়েছিলেন, গ্রামের গরিব দুঃখীরা প্রত্যেক দিন খেতে পেলে পুজো করার দরকার নেই।

৩

আমার অল্প বয়সে যখন ক্লাস সেভেনে সংস্কৃত পড়া শুরু হ'ল, তখন বিদ্যাসাগরের মুখমন্ডল সমন্বিত প্রচ্ছদের সংস্কৃত 'ব্যাকরণ কৌমুদী' হাতে এল। অতি শৈশবে এসেছিল 'বর্ণ পরিচয়'। ব্যাকরণ কৌমুদী না থাকলে পাণিনি ব্যকরণের জটিল গোলকধাঁধায় আজও ঘুরে ঘুরে মরতে হতো সংস্কৃত অধ্যয়নকারী বাঙালিকে। নিয়মের বেড়াজালে আটকে থাকতে হতো। সহজ করে নিয়মগুলো সাজিয়ে তিনি যে সে ভাষার পড়াশুনোকে সুগম করেছিলেন এ কথা অনেকেই জানে। কিন্তু ক'জন জানে যে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আরো মূলগ, আরো মৌলিক? শুধুমাত্র গোপাল বড় সুবোধ বালকের বাইরেও বাংলাভাষাকে গোড়া থেকে পরিষ্করণের কাজে তাঁর অবদান? বিরামচিহ্নহীন, সংস্কৃত-প্রাকৃত-পূর্বীমাগধীর পথ বেয়ে আসা যে পুঁথির ভাষাটি আমাদের উত্তরাধিকার তা প্রথম বিরামচিহ্নে সাজিয়ে শহুরে মান্যতায় উচ্চপদস্থ করে তোলা বিদ্যাসাগরেরই অবদান।

এ কথা তো হলফ করেই বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর যদি না আসতেন আমরা আধুনিক বাংলাভাষাকে স্বচক্ষে দেখতে পেতাম না, বা আরো পঞ্চাশ বছর দেরি হয়ে যেত।... রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর সময়ে অবতীর্ণ হতে পারতেনই না, কেননা যে ধারাবাহিকতায় তাঁর জন্ম তার মূলে তো এইসব মহারথীরাই। পরিমার্জিত বাংলাভাষার রূপটার প্রথম রূপকারই তো রামমোহন, বিদ্যাসাগর। তিনিই প্রথম বাংলালিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও অপরবোধ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন, সুসংহত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কর্মকুশলতা দান করিয়াছিলেন। এর আগের গদ্য ছিল নীরস গতিহীন অসংলগ্ন বাক্যসমন্বিত।"

তিনি রচনা করেছেন জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয়সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ, সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা। বিদ্যাসাগরের হাত পড়েছিল বলেই বাংলা শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের বাঙালি সন্তানদের।

যদি নারী স্বাধীনতা তথা বিধবা বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে তাঁকে প্রতিদিন সকালে একবার করে স্মরণ নাও করি, বাঙালি হিসেবে তো একবার করে স্মরণ করতেই হবে। আমরা জানছি, বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ সালে স্থাপন করেন 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি' নামে একটি বইয়ের দোকান। এই বছরই এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় হিন্দি 'বেতাল পচ্চিসী' অবলম্বনে রচিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। প্রথম বিরাম চিহ্নের সফল ব্যবহার করা হয় এই গ্রন্থে। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সমঅংশীদারত্বে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেন তিনি। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পান্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য এই বছরই নদীয়ার কৃষ্ণনগরে আসেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে সংরক্ষিত মূল গ্রন্থের পাঠ অনুসারে পরিশোধিত আকারে দুই খণ্ডে অন্নদামঙ্গল সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। এই বইটিই সংস্কৃত যন্ত্র প্রেসের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

১৮৫৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জেমস আর ব্যালানটাইন সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দেন, তার মতামত সমালোচনা করে শিক্ষা সংসদে একটি রিপোর্ট দেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে এই রিপোর্ট এক যুগান্তকারী দলিল। বাংলার মানুষকে, দেশের মানুষকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণার এমন উদাহরণ বার বার পঠনীয়। আঠারোশো তিপ্পান্নর নভেম্বরে আন্ডার সেক্রেটারি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গলকে লিখিত চিঠির আকারে এই ইংরেজি দলিলটি যে কোন শিক্ষাবিদের অবশ্যপাঠ্য বলে মনে হয়। গ্রামে গ্রামে অশিক্ষার অন্ধকারে আর অর্থাভাবে ধুঁকতে থাকা অযোগ্য ব্যক্তির মাস্টারি করা যে ইস্কুলগুলি ছিল, সেইগুলির জায়গায় মডেল স্কুল স্থাপনা এবং জেলায় জেলায় বাংলা স্কুল ছড়িয়ে দেওয়া, সেজন্যে টাকা বরাদ্দ করা, সঠিক শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদির বিস্তারিত সেই রিপোর্ট।

৪

ইতিহাস বলে বিদ্যাসাগরের হাত ধরে স্ত্রী শিক্ষার প্রচারের কথা। বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার বিস্তারের পথিকৃৎ। তিনি উপলব্ধি করেন যে, নারীজাতির উন্নতি না ঘটলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিংকওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ভারতের প্রথম ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় মেয়েদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামাঞ্চলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিধায়নী সম্মেলনী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের মধ্যে নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করত। পরবর্তীকালে তিনি সরকারের কাছে ধারাবাহিক তদবির করার পর সরকার এই স্কুলগুলোর কিছু আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৮টি। এরপর কলকাতায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন', (যা বর্তমানে 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত) এবং নিজের মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বীরসিংহে 'ভগবতী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।"

এ তো কেবল শুকনো শব্দমালা থেকে যায়, যদি না অনুভব করি কী বিপুল ত্যাগ স্বীকার, কী প্রচন্ড লড়াইয়ের প্রস্তুতি এবং অবিরত মেয়েদের জন্য ভেবে যাওয়ার ফল এইসব ইস্কুল প্রতিষ্ঠা। যখন বিদ্যাসাগরের বয়স দশ বা এগারো, সেই সময়ে দেশ ছেড়েছেন রামমোহন রায়। যে রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদের জন্য লড়াই করেছেন লাগাতার, সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ কর্মের পাশাপাশি। সতীদাহ অশাস্ত্রীয় এবং নীতিবিগর্হিত প্রমাণ করে পুস্তিকা লিখলেন 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। প্রতিবাদে পুস্তিকা বের হ'ল 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। তার প্রতিবাদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুস্তিকা বের হয়। বাঙলায় ইংরেজ গভর্নমেন্টকে দিয়ে সতীদাহ রদের আইন করিয়ে বিলেতে গিয়েছেন রামমোহন, আর ফেরার সুযোগ পাননি। তার আরো কুড়ি বছর পর বিদ্যাসাগর লড়াই করলেন বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য। তাঁর সকল কাজই সে অর্থে বৈপ্লবিক, অন্তত নবজাগরণের অন্যতম কান্ডারী তিনি। তবু, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমি শুধু নতজানু থাকি তাঁর সেই প্রশ্নটির কাছে – "বিধবার পুনর্বার বিবাহ হবে না কেন। পুরুষের যদি একাধিকবার অক্লেশে বিবাহ হতে পারে, মেয়েদের কেন নয়?"

যে বছর তিনি শিক্ষা জগতে বিশাল পদক্ষেপ রেখেছেন, সেই একই বছর, ১৮৫৩-তে, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা শীর্ষক একটি প্রবন্ধও লিখে প্রকাশ করেছেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব – প্রথম পুস্তক প্রকাশ করছেন। আর সেই বছরই, গল্পকথার বিবরণ অনুযায়ী স্কুল পরিদর্শনকালে পাল্কিতে বসে খসড়া করছেন 'বর্ণপরিচয়'! ১৮৫৫-র এপ্রিল মাসে বাংলা নববর্ষের দিন যুগান্তকারী বাংলা শিশুপাঠ্য 'বর্ণমালা' শিক্ষাগ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশিত হ'ল। কিন্তু তার আগেই বিপ্লবের আগুন তিনি বিধবা বিবাহ বিষয়ে জ্বেলে দিয়েছেন। হিন্দুশাস্ত্র উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন, যে লোকাচার ধর্মের নামে সমাজে

প্রচলিত, আসলে তা ধর্মবহির্ভূত স্থবিরতার আচারমাত্র | তাঁর আন্দোলন সফল হয়েছিল | ১৮৫৬ সালে সরকার বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ ঘোষণা করেন | তবে শুধু আইন প্রণয়নেই ক্ষান্ত থাকেননি বিদ্যাসাগর মহাশয় | তাঁর উদ্যোগে একাধিক বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় | তাঁর পুত্রও এক ভাগ্যহীনা বিধবাকে বিবাহ করেন | এজন্য সে যুগের রক্ষণশীল সমাজ ও সমাজপতিদের কঠোর বিদ্রূপ এবং অপমানও সহ্য করতে হয় তাঁকে | বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সঙ্গে বহুবিবাহের মতো একটি কুপ্রথাকে নির্মূল করতেও আজীবন সংগ্রাম করেন বিদ্যাসাগর মহাশয় | প্রচার করেন বাল্যবিবাহ রোধের সপক্ষেও |

১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে সম্বাদ ভাস্কর লিখল, "প্রতিমূর্তি নির্মাণকারী শ্রীযুক্ত হাডসন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত পুস্তক, যাহা বিধবা বিবাহ পক্ষে লিখিত হইয়াছে, তাহার ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন... হাডসন ছবি এঁকে উপহার দেন বিদ্যাসাগরকে |"

আজ এসব গল্পকথা | এই ২০২০-তেও ভুলি না অধুনা ঘরে ঘরে একাকী নারীর দুর্ভোগ, কতখানি সঙ্কটে নিরাপত্তাহীনতায় তারা, কতখানি সন্দেহের চোখ তাদের চারপাশে ঘোরে | ভুলি না ১৯৬০-এর দশকে বিধবা বাঙালি শিক্ষিতার লড়াই যা আমার নিজের চোখে দেখা নিজের ঘরে দেখা | আর ঊনবিংশ দশকের প্রেক্ষাপটে, একাদশীতে এক ফোঁটা জল খেতে না পাওয়া বালবিধবা মেয়েদের মর্মন্তুদ কান্না আর খেলার সাথীদের থেকে মুহূর্তে আলাদা হয়ে যাওয়া মুন্ডিত মস্তক, সাদা শাড়ি, গহনাবিহীন অবয়বে সমস্ত জীবন ধরে "অপরায়িত" বা আলাদা বলে চিহ্নিত, সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত, খাওয়ার ঘর আলাদা হয়ে নিরামিষ খেতে বাধ্য, এমনকি মসুর ডাল শরীর উষ্ণ করে বলে তাও খেতে বাধাপ্রাপ্ত সেইসব মেয়েদের আমরা কি কল্পনাও করতে পারি? অথচ আমার শৈশবে ঘরে ঘরে কত পিসি, মাসিকে দেখেছি সাদা থান পরিহিতা, "বালবিধবা" ছিল তাঁদের একমাত্র বিবরণ | বৈধব্য জ্বালায় জ্বলতে থাকা প্রায় কিশোরী বা পূর্ণ যুবতীরা কাশীবাস করত অতি করুণ অবস্থায় | কিন্তু আর কোথায় বা তারা সহায়সম্পন্ন ছিল? না পিতৃগৃহে না শ্বশুরগৃহে | অধিকাংশকেই শ্বশুরগৃহে দাসীবৃত্তি করতে হতো এবং হয়তো তাদের সামান্য রাতের ঘুমটুকুও কেড়ে নিত পরিবারের পুরুষরা | আত্মীয় পুরুষদের কুৎসিত কামের বিষয় হতে হতো হয়তো বা, যার ফল সমাজে পতিত হওয়া, অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়া, অথবা চিরজীবন কুলকলঙ্কিনী হিসেবে মাথা নিচু করে বেঁচে থাকা |

বিদ্যাসাগর এদের জন্য নিজের সুখ শান্তি পরিত্যাগ করেছিলেন | তবু সমাজ পাল্টালো কি? আমরা কি সত্যিই তেমন পাল্টালাম? আমাদের জন্য আরেকজন বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন কি এখনও নেই? কোথায় তিনি?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি সাক্ষাৎকার

সাগরিকা বিশ্বাস

এই প্রবন্ধে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করব দুই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এক সন্ধ্যার সাক্ষাৎকার | একজন হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর জন্ম ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে | অপরজন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (পূর্বনাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়), যাঁর জন্ম ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে | উল্লেখযোগ্য হ'ল এই দুই মনীষীর জন্মস্থানের দূরত্ব খুবই কম, মাত্র ২৮ কিলোমিটার | মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রীম অথবা মাস্টারমশাই রচিত 'কথামৃত'তে উল্লেখ আছে যে এই মিলনটি ঘটেছিল ১৮৮২ সালের ৫ই অগাস্ট |

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করতেন | বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন | ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় প্রতিদিনই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন | ক্রমে তিনি ঠাকুরের এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন | ঠাকুর একবার শ্রীমর কাছে বিদ্যাসাগরকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন; বলেছিলেন, যদি তিনি একদিন তাঁকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যান!
সেকথা শুনে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন কোন এক শনিবার বিকেলে ঠাকুরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে | তিনি উৎসুক হয়ে শ্রীমর কাছে এও জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি কীরকম পরমহংস, গেরুয়া কাপড় পরেন কিনা | শ্রীম বিদ্যাসাগরকে ঠাকুরের সম্বন্ধে অবগত করেছিলেন | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রী-রামকৃষ্ণের থেকে বয়সে ১৬ বছরের বড় ছিলেন | কিন্তু আমরা এখানে দেখব শ্রীরামকৃষ্ণ কেমনভাবে তাঁর সরল, স্বাভাবিক, সুগভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে শিক্ষক বা বক্তার ভূমিকায় ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর ছিলেন শ্রোতার ভূমিকায় |

১৮৮২ সালের ৫ই অগাস্ট দক্ষিণেশ্বর থেকে রওনা হয়ে কয়েকজন ভক্তসহ ঠাকুর ও শ্রীমর ঘোড়ার গাড়ি বিকেল চারটে নাগাদ আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে বাদুড় বাগানে ঈশ্বরচন্দ্রের দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল | শ্রীম বিদ্যাসাগরের বাড়ির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন, সে বাড়ি তাঁর অতি পরিচিত | দোতলায় যে ঘরে বসে বিদ্যাসাগর কাজকর্ম করেন, সেখানে একটা বড় টেবিল আছে | সেই টেবিলের ওপর অনেক চিঠিপত্র, হিসাবের খাতা, কিছু বই ইত্যাদি রয়েছে | যে চিঠিগুলো সেখানে রয়েছে তার একটি ভারি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন মাস্টারমশাই, যা আমি এখানে উদ্ধৃত করছি – "টেবিলের ওপর যে পত্রিকাগুলি চাপা রহিয়াছে – তাহাতে কী লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়তো লিখিয়াছে, আমার অপগন্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হইবে | কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে | কোন গরিব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই | কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খাইতে পারিতেছে না – আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হইবে | তাঁহার স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইবে | এ বেতনে আমার চলে না | হয়তো কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন | কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত, আপনি সেদিন আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবেন |" এই উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে দিয়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিস্তৃত কর্ম পরিধির চিত্র আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে |

ঠাকুরকে নিয়ে শ্রীম যখন গাড়ি থেকে নামছেন, তখন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে – এতে কোনো দোষ হবে না তো?"
শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ে লংক্লথের জামা, লালপেড়ে কাপড়, যার আঁচল কাঁধে ফেলা | শ্রীম উত্তর দিলেন, "আপনার কিছুতেই দোষ হবে না |" ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন | ভক্তগণসহ তিনি ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন | গাড়ি থেকে নামার সময় থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমত্ত অবস্থা | বিদ্যাসাগরের সামনে গিয়েও সেইরকমই ভাবাবিষ্ট হয়ে ছিলেন | বিদ্যাসাগরের সামনের

বেঞ্চে বসার সময় ঠাকুর বললেন, "জল খাব"| বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে নিজেই ভেতরে গিয়ে কিছু মিষ্টি ও জল ঠাকুরের জন্য নিয়ে এলেন | খেয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ঠাকুর বললেন, "আজ সাগরে এসে মিললাম | এতদিন খাল, বিল, হদ্দ (হ্রদ), নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি |" সেই কথায় বিদ্যাসাগর বললেন, তাহলে খানিক নোনাজল যেন তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান | তার উত্তরে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের প্রভূত প্রশংসা করলেন, বললেন, তিনি তো অবিদ্যার সাগর নন, তিনি বিদ্যার সাগর, ক্ষীর সমুদ্র | তাঁর কর্ম সাত্ত্বিক, যা থেকে দয়া হয় | বললেন, তিনি বিদ্যাদান করছেন, অন্নদান করছেন – দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য হ'ল বিদ্যার ঐশ্বর্য | ঠাকুর আরো বললেন, ব্রহ্ম হলেন বিদ্যা ও অবিদ্যার ওপরে |

তিনি বলে চলেছেন, এই জগতে বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুইই আছে | জ্ঞান ভক্তি আছে, কামিনী কাঞ্চনও আছে | সৎ আছে, অসৎও আছে | ভাল আছে, মন্দও আছে | ব্রহ্ম কিন্তু নির্লিপ্ত | সূর্য শিষ্টের ওপর এবং দুষ্টের ওপর আলো দিচ্ছে | দুঃখ, পাপ, অশান্তি এসব হ'ল জীবের পক্ষে | ব্রহ্ম নির্লিপ্ত | ব্রহ্ম যে কী, তা মুখে বলা যায় না | বেদ, পুরাণ ষড়দর্শন – মুখে পড়া হয়েছে, তাই উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে | শুধু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয়নি, কারণ তা যে কী কেউ মুখে প্রকাশ করতে পারেনি | এই ব্যাখ্যাটি বিদ্যাসাগরের খুব পছন্দ হ'ল | তাই বললেন, "আজ একটা নতুন কথা শিখলাম |"

এরপর ঠাকুর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নির্বিকল্প সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে অনেকগুলো গল্প বলেছেন | বলেছেন, সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পরে মানুষ কোনও কথা বলতে পারে না | সেই প্রসঙ্গে তাঁর গল্প হ'ল – নুনের পুতুল সমুদ্রের গভীরতা মাপতে গেল | সে মেপে বলবে সমুদ্রের জল কতটা গভীর, কিন্তু যেই জলে নামল, সে গলে গেল; খবর দেওয়া আর হ'ল না | শ্রোতাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন সমাধিস্থ ব্যক্তি কি আর কোনও কথা বলেন না! সেখানেও ঠাকুর কিছু গল্প শোনালেন | যেমন – মৌমাছি যতক্ষণ না ফুলে বসছে, ভন ভন করে | ফুলে বসে সে যখন মধু পান করে তখন সে শান্ত হয়ে যায় | আবার বললেন কলসিতে যখন জল ভরা হয় তখন শব্দ হয় | কিন্তু যখন সেটা ভরে যায়, তখন আর কোনো শব্দ হয় না | শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা উপদেশ দিয়েছেন কী করে ঈশ্বরলাভ করা যায় | তাই বলেছেন, 'আমি আমি' ভাবটা ত্যাগ করতে হবে | যাদের 'আমি'টা যায় না তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এভাবে ভাবাও ভাল, অর্থাৎ সেব্য-সেবক ভাবটাই শ্রেয় | ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য জ্ঞানীর পথ একটা পথ, জ্ঞান-ভক্তির পথ আর একটা পথ, আবার ভক্তির পথও পথ | সব পথ দিয়েই তাঁর কাছে পৌঁছানো যায় | কিন্তু যতক্ষণ তিনি 'আমি' রেখে দেন ততক্ষণ ভক্তিপথই সহজ | জ্ঞান হবার পরে বোঝা যায়, ভগবান আর ব্রহ্ম এক | আর এই জীব-জগৎ, মন-বুদ্ধি, ভক্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞান সবই তাঁর ঐশ্বর্য |

ঠাকুর স্মরণ করালেন এই জগতের সৌন্দর্যের কথা, যা চাঁদ সূর্য নক্ষত্র নিয়ে গঠিত; কারো শক্তি বেশি, কারো কম | এখানে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন, ঈশ্বর কাউকে বেশি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন কিনা | ঠাকুরের উত্তর, তিনি ঈশ্বররূপে সকলের মধ্যেই আছেন, এমনকি পিঁপড়ের মধ্যেও আছেন | দেখা যায়, একজন মানুষ দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছে হেরে পালিয়ে যায় | তারপরেই বিদ্যাসাগরকে বললেন, তাঁকে সবার এত মান্য করার কারণ হ'ল তাঁর বিদ্যা ও দয়া |

এরপর ঠাকুর বলেছেন যে শুধু পান্ডিত্য আর পুঁথিগত বিদ্যায় কিছু হয় না | তাঁর মতে ঈশ্বরলাভ করার জন্যই বিদ্যা অর্জন | আবার কয়েকটি অসাধারণ গল্প শোনালেন –

একজন সাধুর কাছে একটি পুঁথি দেখে একজন জানতে চাইলেন তাতে কী লেখা আছে | সাধু পুঁথি খুলে দেখালেন প্রতিটি পাতায় শুধু লেখা আছে 'ওঁ রাম'| গীতার প্রধান যে বাণী, তা স্মরণ করালেন – সবকিছু ত্যাগ করে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করা |

এই বিষয়ে তাঁর অন্য একটি গল্প: চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে তীর্থ ভ্রমণের সময় দেখেছিলেন, একজন গীতা পড়ছে, একজন দূরে বসে শুনছে আর অঝোরধারে কাঁদছে | চৈতন্যদেব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন – সে সব বুঝতে পারছে কিনা | তার উত্তর ছিল, গীতার শ্লোকের কোন অর্থই সে বুঝতে পারছে না; কিন্তু সে দেখছিল অর্জুনের রথ, আর তার সামনে ঈশ্বর এবং অর্জুন কথা বলছেন – সেই দেখে তার কান্না পাচ্ছে |

এরপর ঠাকুর ভক্তিযোগের কথা বলেছেন – সমাধিস্থ অবস্থায় 'আমি' চলে যায়, কিন্তু আবার এসে পড়ে | সাধারণ মানুষের

অহংকার যেতেই চায় না | আবার একটি সুন্দর উপমা দিলেন, গরু 'হাম্বা হাম্বা' (আমি আমি) করে, তাই তাকে অত যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় – রোদে বৃষ্টিতে লাঙল টানতে হয়, কসাই তাকে কাটে, তার চামড়া দিয়ে জুতো তৈরী হয়, ঢোল হয় – লোকে সেটা খুব পেটায় | সেখানেই শেষ নয় – তার নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তাঁত তৈরী হয়; তখন আর সে 'আমি আমি' করে না; সে তখন 'তুঁহু তুঁহু' করে (অর্থাৎ তুমি তুমি)| এরপর তার নিস্তার |

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণে রাখা দরকার, যার পরে আর কিছুই থাকবে না | পৃথিবীতে আমাদের আসা শুধু কিছু কাজ করতে | বললেন, ভগবান মানুষের দুটো কথায় হাসেন | ডাক্তার এসে যখন রোগীর মাকে বলেন, 'মা ভয় কী, আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দেব |' তখন ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন যে তিনি মারছেন আর ডাক্তার বলছেন তিনি নাকি ভাল করে দেবেন! ঈশ্বরই যে কর্তা, সে কথা ভুলে গিয়ে তিনি ভাবছেন তিনিই কর্তা! আবার যখন দু'ভাই দড়ি ফেলে জমি ভাগ করে বলে, 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আবার হাসেন, ভাবেন এই বিশ্বচরাচর তাঁর, আর ওই দু'ভাই ভাবছে তাদের!

ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলেছেন, পান্ডিত্যের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না | তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাকতে হয় | বিদ্যাসাগরের কাছে ঠাকুর জানতে চাইলেন, তাঁর কী ভাব! তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, সে কথা তিনি ঠাকুরকে আলাদাভাবে জানাবেন | এর পরই ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে একটি গান ধরলেন – 'কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন'... গান শেষ করে তিনি তাঁর ভাব খানিকটা সংবরণ করলেন |

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎটি শেষ হবার আগে ঠাকুর আরো একটি গল্পের মধ্যে দিয়ে বোঝালেন, বিশ্বাস ও ভক্তির কত শক্তি | এক ব্যক্তি লঙ্কা থেকে সমুদ্র পেরিয়ে যাবে | বিভীষণ তাকে ছোট একটি জিনিস দিয়ে বলেছিলেন সেটা কাপড়ের খুটে বেঁধে রাখতে, তাতে সে নির্বিঘ্নে সাগর পেরিয়ে চলে যেতে পারবে | সেই উপদেশ ব্যক্তিটি শুনেছিল এবং জলের ওপর দিয়ে ভালই চলছিল; কিন্তু খানিকটা যাবার পর তার কৌতূহল হ'ল খুঁটে সে কী বেঁধেছে সেটা দেখার | খুঁটটা খুলে সে দেখল যে একটা পাতায় শুধু লেখা আছে 'রাম'| ভাবল শুধু এই জিনিস! আর সেই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই সে জলে ডুবে গেল | গল্প শেষ করে ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে কোন কিছুতেই আর ভয় থাকে না | এরপর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে তিনি গান ধরলেন, 'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি, আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী'|

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দু'শ বছরের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার রচনাটি শেষ করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটি স্মরণ করে –

"... এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল | কারণ তিনি সর্ব বিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন | বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন | সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন | কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন... |"

{আমার দিদি, মালবিকা চ্যাটার্জীর কাছে যখন শুনেছিলাম 'প্রবাস বন্ধু' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০০ বছর জন্মপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে, আমার ইচ্ছে হ'ল এই মহৎ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করার |}

রেঙ্কোজির খোঁজে

বলাকা ঘোষাল

আগেই বলে রাখি যে ঘটনাটা আজকের নয়। বেশ কিছু বছর আগের কথা – ২০০৯-এর গরমকাল। তখনও গুগুলবাবুকে আমি সিধু জ্যাঠার স্টেটাস দিইনি যে কথায় কথায় একটু খুঁচিয়ে পৃথিবীর সব তথ্য জেনে নেব। স্বামীর চাকরির কল্যাণে দুনিয়ার বেশ কিছু আনাচকানাচ ঘুরে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, সেইসব মনোলোভা দেশগুলোর মধ্যে জাপান একটি উজ্জ্বল তারা। তার উপরে অন্য অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে রেঙ্কোজির মন্দির দর্শনের কথাটুকু যেন না বললেই নয়। কয়েক বছরে স্মৃতির কোনায় কোনায় কিছু ধুলো পড়েছে। জাপানবাসী বাঙালি পাঠকবৃন্দ হয়তো অনেক তথ্যে গোঁজামিল খুঁজে পাবেন। এই স্মৃতিচারণ ইতিহাস বা ভূগোল শেখানোর জন্য নয় – বরং হঠাৎ বিদেশে একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের দিনের রোমন্থনই এর সঠিক পরিচয়।

নানা কাজের মাঝে জাপানে বেড়াতে যাওয়ার উত্তেজনা বহু প্রস্তুতি পর্বের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে ছিল। ভাবলাম একবার প্লেনে বসলে ঘুম আর জাপানের স্বপ্নের ডেবিট-ক্রেডিট মেলানো যাবে। কিন্তু প্লেনে বসে চোখের সামনের স্ক্রীনে যখন ডিজিটাল ম্যাপ দেখতে থাকলাম তখন ঘুম মুলতুবি রেখে মানচিত্রেই মন ডুবল। বেশ কয়েক ঘন্টা পরে রাশিয়া ঘেঁষে যখন প্লেনটা জাপানের দিকে মোড় ঘুরছে, তখন নেতাজীর কথা যে মনে হয়নি তা নয়। ফরমোসা বা আজকের তাইওয়ান খুব একটা দক্ষিণে তো নয়! তবে ওই মনে হওয়া অবধিই। মাথায় তখন ভর্তি হিরোসিমা, সুপারফাস্ট শিন্‌কান্‌সেন্‌ ট্রেন যাতে চড়ে মাইলস্টোনগুলো দেখায় চিরুনির দাড়ার মতন, ফুজিয়ামা চড়তে না পারলেও অন্তত বেস-ক্যাম্পে যদি যাওয়া যায়, জাপানের সাজানো বাগান আর রবিবাবুর বইতে পড়া জাপানী চা-পানের অভিনব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ঘুরছে মাথায় তখন। জাপানের সাথে নেতাজীর জীবনের যে গভীর সম্পর্ক তা চিরকালের – তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বপ্নের কাঠামোর অনেকটা ওই জাপানের মাটিতেই। কিন্তু সেসব যে খুঁজব সেরকম ভাবিইনি। নেতাজীর জীবনের মাহাত্ম্য আমাদের কাছে চিরকালের সম্পদ – তাঁর বিতর্কিত মৃত্যুর থেকে বহুগুণ বেশী। কিন্তু তবুও সলজ্জে স্বীকার করছি যে নেতাজীকে ঘিরে জাপানে সময় কাটাব সেরকম কোনও পরিকল্পনা ছিল না; সাধারণ পর্যটকের মতো পরিচ্ছন্ন আর ভদ্র একটা সভ্যতা দেখতে পাব সেটাই ছিল তালিকার উপরে।

আমেরিকা থেকে সূর্য ওঠার দেশে যাবার সারাটা পথেই পেলাম চড়া রোদ। জানলার ঢাকা মাঝে মাঝে তুলে দেখেছি বটে, কিন্তু চোখ ধাঁধানো রোদে তাকানো দায়। বেলা বারোটায় রওনা দিয়েছিলাম হিউস্টন থেকে, আর তারপর টানা সাড়ে তেরো ঘন্টা ধরে আমরা সেই বেলা বারোটাতেই পড়ে থাকলাম। সময় থমকে দাঁড়ানোর এরকম নজির বড় একটা নেই।

জাপানে পৌঁছে একেবারে সাধারণ মানুষের মতন তাঁদের জীবনযাত্রায় মিশে যেতে থাকলাম। আমার স্বামীর অফিস ইয়োকোহামাতে। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে বাজার হাট, রান্না, নতুন দেশে নতুন নিয়মে হতে লাগল। ওই যে বললাম, পৃথিবীর সবকিছু তখন গুগুল-জ্যেঠুকে জিজ্ঞেস করাটা স্বভাবে দাঁড়ায়নি। তাই এঁরা নিজেদের দেশকে জাপান না বলে নিপ্পন কেন বলে আর জাপানী ভাষাটাকেও এঁরা কেন বলে নিহঙ্গ সেসব জানা হয়নি তখনও। মাসখানেক হ'ল এখানে আছি শুনে আমাদের কলকাতাবাসী ভ্রমণপিপাসু বন্ধু সুকান্ত, ওরফে সুকু, জিজ্ঞেস করে বসল রেঙ্কোজির মন্দিরে গিয়েছি কিনা। রেঙ্কোজি? কই, না তো! মাথাতেই তো আসেনি! আমরা ইয়োকোহামার ওডামায়াগুচির নাকাকু অঞ্চলের একটি গলিতে থাকি। ভাষা না জেনে হাত পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। নানা জায়গা ঘুরে রোজ যে ঠিকঠাক বাড়ি ফিরে আসি এটাই আশ্চর্য। সুকুর কথা শুনে মনে হ'ল গেলে হয় রেঙ্কোজির সন্ধানে। আজকাল সেলফোন হাতে থাকলে তেপান্তরের মাঠ পেরোতেও ভয় লাগে না। কিন্তু বাধ সাধল নাকি ওই নামটা। পার্থ শুনেই বলল অসম্ভব – এ নাকি অযোধ্যায় হনুমানজির মন্দিরের খোঁজ করা। পাড়ায় পাড়ায় রেঙ্কোজির মন্দির পাওয়ার সম্ভাবনা। ঠিক ততটা না হলেও রেঙ্কোজি যে বৌদ্ধ মন্দির সেকথা তো ঠিক! তবে শহরে তিন পা দূরে দূরে নয়। তবু ওই অঞ্চলে সত্যি বেশ কয়েকটি রেঙ্কোজির মন্দির রয়েছে। ইয়োকোহামার ম্যাপ ঘেঁটে দেখলাম সেখানেও একটি রেঙ্কোজির মন্দির। এইটি

বাঙালিদের সেই ঐতিহাসিক রেঙ্কোজি না হলেও ভাবলাম সেটা দিয়েই শুরু করা যাক | কাল থেকে শুরু হবে সেই অভিযান | গুগুল করলে কাজটা যে কত সহজ হতো! কিন্তু এই বিরল অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম তাতে সন্দেহ নেই | তাই নেই কোনো আপসোস |

সকাল হতেই মনমেজাজ বেশ আলাদা | আর সাধারণ পর্যটকের মতন মনে হচ্ছে না | আমি যেন একটা তীর্থে চলেছি | খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি | বাসে করে হোনমুকুডোরি ধরে একটু গেলেই একটা পাহাড়ের তলা দিয়ে এক লম্বা টানেল কেটে রাস্তা | তার ওপারেই মোতোমাচি; মোতোমাচির সুনাম শপিং-এর জন্য | সেখানে মানুষ পায়ে হেঁটে ডাকসাইটে ব্র্যান্ডের দোকানে উইন্ডো শপিং করে থাকে | এই গলিতে গাড়ি ঢোকা মানা | রীতিমতো বিত্তবানদের আর সাহেবদের পাড়া | কিন্তু হোনমুকুডোরির উল্টোদিকের মোতোমাচির একেবারে অন্য চরিত্র | দোকানের সামনে ঠেলাগাড়িতে কাঁচের কাপ-প্লেট বিক্রি হচ্ছে; কী অনন্য সব মনকাড়া ছোটখাটো জাপানী কারিগরি | আর একটু এগোলেই একেবারে যেন মানিকতলার অলিগলি | কিছু গলি এত সরু যে সাইকেল নিয়ে গেলেও একটু ভাবতে হবে | অথচ সেইসব বাড়ির দরজার বাইরে ফুলের টবের সারি | একটা ঘরোয়া যত্ন আর সৌন্দর্যের ছোঁয়া | আমরা যে সমতল ছেড়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছি ধীরে ধীরে সেটাও টের পেয়েছি | দূরের ইয়োকোহামার বিস্তার বাড়িঘরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে | বড় রাস্তাটাও ফাঁকা, কোনও কোনও ইস্কুলে ছুটি হয়ে গেছে – বাচ্চারা নিজেরাই ফেরে অভিভাবক ছাড়া, মাপে আর বয়সে তারা যত খুদেই হোক না কেন |

হঠাৎ চোখে পড়ল সুন্দর মন্দিরটি | কোন বিশেষ আড়ম্বর নেই অথচ সম্পূর্ণ প্রশান্তির ছায়া বিছিয়ে আছে | মন্দিরের দরজা বন্ধ | সামনের উঠোনে দুটো বড় গাছের নীচটা বাঁধানো বসবার জন্য | চুপচাপ বসে রইলাম | কোনও মানুষের দেখা নেই যে জিজ্ঞেস করব মন্দির ক'টায় খুলবে | অনেক মন্দিরের মতন হয়তো এও দুপুরে বন্ধই থাকে | ভাবলাম এখানে তো সবই নিরাপদ, দেখি না এঁরা ছিটকিনি এঁটে রেখেছেন কিনা, নাকি ভিতর থেকে শুধু ভেজানো দরজা | জাপানের দরজা স্লাইড করে পাশে ঠেলতে হয় | ওমা, তাই তো! দরজা তো খোলা! যে কেউ ঢুকে ভিতরে বসতে পারে | ধানগাছের শুকনো খড়ের চাটাই দিয়েই এখানে মেঝে ঢাকা হয় | তাকে বলে তাতামি – শোবার ঘর, মন্দির সব ওই তাতামি দিয়ে ঢেকে দেয় | নিস্তব্ধ মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বসলাম বুদ্ধদেবের মূর্তির সামনে | পিছনের দেওয়ালে অনেকগুলো ব্যাগ ঝুলছে, বোঝাই যাচ্ছে যে রবিবার বাচ্চাদের ধর্মশিক্ষার ক্লাস হয় | জাপানী ধূপের গন্ধে বাতাসটা শান্তিময় | এমন সময় পাশের একটা ছোট্ট দরজা দিয়ে একজন ভিতরে এসেই কোমর থেকে ঝুঁকে কুর্নিশ করলেন | লম্বা, বয়স্ক এক সন্ন্যাসী | পরমুহূর্তেই চলে গেলেন | অনুমান করলাম যে তিনি জাপানী ছাড়া কিছু জানেন না, তাই আমাদের বিদেশী দেখেই কাউকে খবর দিতে গেছেন | ঠিক তাই | কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন অল্পবয়সী সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে বললেন, "আপনারা কি চন্দ্র বোসের খোঁজে এসেছেন?" আমি তো অবাক | ভাবলাম মন পড়তে পারেন নাকি ইনি! নইলে জানলেন কী করে যে আমরা সুভাষ চন্দ্র বোসের খোঁজেই এসেছি? ওই যে বললাম গুগুলকে তখনও সিধু-জ্যাঠা বানাইনি | নইলে এই অভিজ্ঞতাই হতো না | ভারতীয় দেখে এই অনুমান করা যে কত সহজ সে তো তখন মাথাতেই আসেনি | উনি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন ওঁদের অফিসে | সে ভারি মজার অফিস | তাতামির চাটাই মোড়া মেঝে, নীচু নীচু জলচৌকি হ'ল অফিসের ডেস্ক, আর একটা ছোট্ট তাক হ'ল ফাইল-ক্যাবিনেট | আমরা হাঁটুমুড়ে বসলাম সেখানে, আর সেই সন্ন্যাসী 'এক্সকিউজ মি' বলে চলে গেলেন | একটু পরেই একটি ছেলে জাপানী চা দিয়ে গেল সুন্দর কাপে করে | এই কাপের হাতল নেই, যেন ছোট

ছোট বাটি, দুহাতে অঞ্জলি করে তুলে নিয়ে পান করতে হয় | জাপানী চা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জাপানী চা-পান যদি পড়ে

থাকেন তাহলে সাধ নিশ্চয়ই আছে সেটা একদিন অনুভব করবার | আমারও ছিল | মনে হ'ল আহা, এ কী অভিনব অভিজ্ঞতা! আজ সব সাধের ষোলোকলা পূর্ণ | কিন্তু প্রথম চুমুক দিয়ে শুধু এইটুকু বলব যে এই চা-পানের সাধ যদি থাকে তবে স্বাদ পাবেন না | দেখতে ধনেপাতার চাটনি মনে হলেও খেতে অনেকটা মেহেন্দিপাতা বাটার মতন | তবু রবিবাবুর খাতিরেই খেয়ে নিলাম | আমার ছেলেকে বেগ পেতে হ'ল অনেক বেশী | এদিকে সন্ন্যাসী সেই গেছেন তো গেছেন, ভাবছি হ'ল কী!

অবশেষে তিনি এলেন | হাতে বেশ কয়েকটা কাগজপত্র | প্রথমে আমাকে একটা চিঠি দিলেন "ডিয়ার ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ট" বলে | দেখলাম ইংরিজিটা মন্দ লেখেন না, চিঠি টাইপ করে এনেছেন বলেই এতটা সময় লেগেছে ওঁর | সাল-তারিখসহ অনেক ভুলত্রুটি-মোড়া চিঠির মর্ম এই যে আমরা নেতাজীর "গ্রেভ" খুঁজতে ভুল মন্দিরে এসেছি | কোথায় যেতে হবে এবং কীভাবে যেতে হবে তার ম্যাপ আর নির্দেশ সব ছাপিয়ে এনেছেন | আমরা তো কৃতজ্ঞতায় অভিভূত | দুপক্ষই অনেকবার কোমর ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে আরিগাতোগোজাইমাস বলে চললাম | অতঃপর আমরা রওনা দিলাম, বাড়িমুখো | রেঙ্কোজির সেই মন্দির টোকিয়োর উত্তরভাগে | এদিকে তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় তিনটে | কাজেই আজকের জন্যে আমাদের তীর্থ স্থগিত রইল |

বাড়ি ফিরেই পরদিনের প্ল্যানিং শুরু – এবার কম্প্যুটার ভরসা | জরুডান হ'ল জাপানের ট্রেনের অনলাইন টাইম টেবিল | শুধু যে সময়সূচী তা নয়, কোথা থেকে কোথায় কতভাবে যাওয়া যায় তাও বলে দেবে | এমনকি হাতে সময় বেশী পয়সা কম থাকলে, কোন কোন লাইনের ট্রেন নেওয়া ভাল, বা ঠিক উল্টোটা – যাদের আছে সময়েরও তাড়া, আর নোটেরও তাড়া, তাঁদের জন্য সুপারফাস্টগুলো কোথায় আর কটায় কানেক্ট করছে, যারা বারে বারে ট্রেন বদলাতে ভয় পান তাঁদের জন্যও প্ল্যান বাতলানো আছে | আর যারা প্রতিটি কানেক্টিং স্টেশনে নেমেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন কখন পরের ট্রেনটা আসবে, তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা আছে | সে এক এলাহী ব্যাপার! আমাদের গন্তব্য সুগিনামি অঞ্চল | তাই যেতে হবে হিগাশিকোয়েঞ্জি স্টেশনে | আমাদের পকেটে সুইকা নামের মান্থলি কার্ড ছিল, যত খুশী যা খুশী চড়ো | তাই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় এমন ট্রেনগুলোই নিলাম | মন আর তর সইছে না যে!

জাপানে ভোর হয় ভীষণ তাড়াতাড়ি | সাধে কি বলে সূর্য ওঠার দেশ? সকাল সাতটা যেন অনেক বেলা | ভোর চারটে থেকে জাপান নড়েচড়ে বসে | আমারও উত্তেজনায় ঘুম উধাও | অফিসের ভীড় শেষ হতেই বেড়িয়ে পড়লাম মা আর ছেলে | তিনবার বাস আর ট্রেন বদলে প্রায় ঘন্টা দুয়েক বাদে হিগাশি-কোয়েঞ্জীতে নামা হ'ল | তারপর লম্বা হাঁটাপথ শানশিনোমোরি পার্কের পাশ দিয়ে | সে চলেছি তো চলেছিই | তবে, কেন জানি না কোনও ক্লান্তি লাগেনি | অবশেষে ম্যাপ ঘেঁটে যখন পৌঁছোলাম সেই গলিতে, দেখি মন্দিরের সামনে

রেঙ্কোজির মন্দির

সারি সারি কালো পোশাকপরা লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, গম্ভীর মুখে, মাথা নীচু করে | গলির ওপারেও আরেক সারি মানুষ দাঁড়ানো, সেই কালো বুট আর কোটে | মন্দিরের ভিতরেও তাই | বুঝলাম এটা সাধারণ কোনও ব্যাপার নয়; বিশেষ কিছু একটা হচ্ছে | মনটা একটু দমে গেলেও, আমার অদম্য কৌতূহল তখনও উপচে পড়ছে | এই সেই মন্দির তো? কোথাও হিসেবের ভুল হয়নি তো? কিছুটা দূরে গিয়ে পায়ের আঙুলের উপর ভর করে পাঁচিলের উপর দিয়ে দেখতে পেলাম কালো ধাতুর একটা মূর্তির উপরাংশ – সেই টুপি আর গোল চশমার ফ্রেম | ব্যস, এই সেই রেঙ্কোজী | এ মূর্তি নেতাজীর না হয়ে যায় না | দারুণ উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছি | এমন সময় হঠাৎ গেটের কাছ থেকে একজন এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে জিজ্ঞেস করলেন, "লুকিং ফর চন্দ্র বোস?" আমি তো হাঁ! এরা সবাই মন্ত্র জানে বুঝি? মন পড়তে পারে কী করে? কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে "হাই, হাই" অর্থাৎ

"হ্যাঁ" বলতেই তিনি চলে গেলেন ভিতরে | আমার অবাক হওয়া তখনও শেষ হয়নি | ছেলেকে বললাম, "এও কী করে জানল বল তো?" কালও তাই হয়েছে, আজও তাই, আমি তো প্রায় অলৌকিক দৈব যোগাযোগ মনে করছি | আমার বারো বছরের ছেলেটি হিউস্টন দুর্গাবাড়িতে রবিবারের বাংলা-স্কুলের সৌজন্যে আর বাড়ির আলোচনায় নেতাজীর সাথে যথেষ্ট পরিচিত হলেও, ওর কোনও ভাবাবেগ নেই | মার্কিনি তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, "মা, তুমি ভুলে যাচ্ছ, ইউ লুক লাইক অ্যান্ ইন্ডিয়ান | আর ইন্ডিয়ান দেখলেই ওরা বুঝে যায় কেন এসেছ |"

হা হরি! সত্যিই তো! আমেরিকা থেকে কোথাও বেড়াতে গেলে এই হয় মুশকিল | কেউ যখন জানতে চান কোথা থেকে এসেছি, মুখ থেকে হিউস্টন বেরিয়ে যায় | অথচ দেখতে যে নিপাট ভেতো বাঙালির মতন সেটা বেমালুম যাই ভুলে | ছেলের কথায় তাই হেসে বাঁচি না | জাপানীদের মন্ত্রবলে মন পড়তে পারবার দৌড় টের পাওয়া গেল যাহোক |

ইতিমধ্যে ভদ্রলোক ফিরে এলেন আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য | এও বললেন যে আজ মন্দির প্রতিষ্ঠাতার ছেলের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হচ্ছে | শুনে আমি ইতস্তত করছি – এই শান্ত পুজোর পরিবেশটা নষ্ট করতে চাইছিলাম না | তিনি দুঃখের সাথে জানালেন যে একেবারে মন্দিরের ভিতরে যেখানে নেতাজীর ভস্মপাত্রটি রাখা আছে সেখানে আজ যাওয়া যাবে না | কিন্তু আমরা সামনের উঠোনে রাখা মূর্তির সামনে গেলে কোনও অসুবিধা নেই |

তাই সই | গেট দিয়ে ঢুকে মন্দিরের সিঁড়ির বাঁপাশে একটা উঁচু পেডেস্টালে নেতাজীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে অবাক লাগল |

সামনে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম | চোখ বুজে বসে অনুভব করতে ইচ্ছে হ'ল তাঁর সূর্যের মতন ব্যক্তিত্বকে, ভারতকে ঘিরে তাঁর স্বপ্ন | এমন সময় শুনি পুরুষকণ্ঠে প্রশ্ন, "আপ হিন্দি জানতে হ্যায়?" 'দিল্লী চলো' ভাবতে ভাবতে সত্যিই হিন্দি শুনতে পাবো এ কী করে সম্ভব! আমি চোখ খুলে ধীরে ধীরে উপরে তাকিয়ে দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে | অবশ্যই জাপানী | আমি ততক্ষণে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি | তারপর যা জানতে পারলাম তা শুনে আমার মনোভাব আপনারাই কল্পনা করে নিন | ওঁর নাম মিস্টার নেগেশী | প্রথমে ভাঙা হিন্দি, তারপর ইংরেজিতে জানালেন

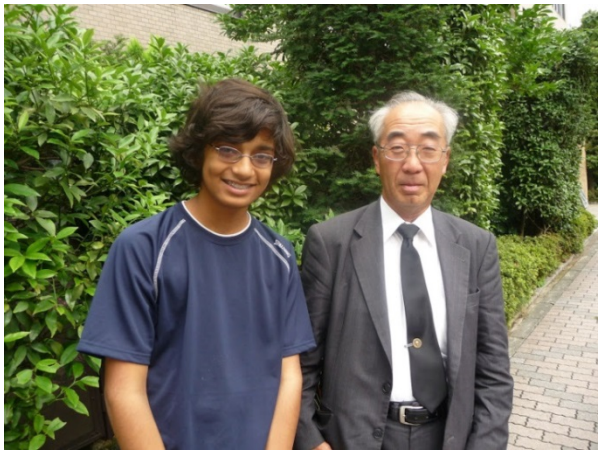

আকাশ এবং মিস্টার নেগেশী

যে ওঁর জন্ম কলকাতায় | বছর চারেক বয়স অবধি বালিগঞ্জ প্লেসে থাকতেন | পাঁচ বছর বয়সে সদ্য স্বাধীন দিল্লীর রিপাবলিক ডে প্যারেডেও গিয়েছিলেন, তার একটু একটু নাকি এখনও মনে আছে তাঁর | তাঁর বাবা মাদ্রাজে কর্মসূত্রে বেশ কিছুদিন ছিলেন | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় নানা কারণে তিনি আর ফিরতে পারছিলেন না | তাই তাঁর মাকে বাড়ির লোকেরা জাহাজে করে বিয়ে করতে পাঠিয়ে দেন ভারতে | আত্মীয়স্বজনের থেকে অনেক দূরে সেই মাদ্রাজেই বিয়ে হয় তাঁদের |

কিন্তু আসল যে অবাক করা তথ্য, তা হ'ল – তাঁর বাবা ১৯৪৩-এ গিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার সেই সাবাংদ্বীপে, নেতাজীকে সাবমেরিন থেকে রিসিভ করতে | জেনেরাল ইয়ামামোতোর সঙ্গে গুটিকতক লোকের মধ্যে তাঁর বাবাও ছিলেন দোভাষী হিসেবে | আমি ঠিক আর কতটা অবাক হব জানি না | নেতাজীর সেই যাত্রা নিয়ে উনি কতকিছু বলে চললেন আপ্লুত হয়ে | নেতাজীর প্রতি ওঁর বাবা মা'র শ্রদ্ধার কথা বলতে বলতে উনি বেশ ইমোশানালই হয়ে পড়ছিলেন |

তার সাথে ভারতের স্বাধীনতা, নেতাজীর উচিত মতন স্বীকৃতি না পাওয়া, ভারত সরকারের অবজ্ঞা ইত্যাদি অনেক অভিমানের কথা। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান তখনও চলছে। তিনিও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। আমরা মন্দিরের বাইরে এসেই কথাবার্তা বলছি। উনি এত ভাল ইংরেজি কী করে জানেন জিজ্ঞেস করায় বললেন তিনি পেশায় এঞ্জিনিয়ার হয়েও রিটায়ার করে এখন বিদেশী টুরিস্টদের গাইড হিসেবে কাজ করেন। হঠাৎ মিস্টার নেগেশী বা জাপানী কায়দায় "নেগেশী-সান" বললেন, "আপনাদের হাতে সময় আছে? তাহলে চলুন, আপনাদের একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাই। জাপানে প্রথম গান্ধী মূর্তি স্থাপনা করা হয়েছে একটা পার্কে আর তার লাগোয়া সুগিনামি সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেখানোর জন্য একটা বড় গ্যালারীর খানিকটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

এইবার পড়লাম ফাঁপরে। চিনি না জানি না একজনের সাথে কোথায় যাব আমরা টোকিও শহরে? কেনই বা যাব? আবার উনি এমনই উদগ্রীব হয়ে আছেন যে এত কথার পর "না" বললে যেন ভীষণ দুঃখ পাবেন। এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। উনি আশ্বাস দিয়ে বলছেন তিনি আমাদের ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবেন, আর ভাড়াও তিনিই দেবেন। নানাভাবে 'না' বলাতেও তিনি কাকুতি মিনতি করেই চলেছেন। মহা মুশকিল! শুধু আমার বিপদ নয়। আকাশের বয়স তখন সবে বারো। আমার ভাবালুতা ওকেও বিপদে ফেলবে।

হঠাৎ মনে হ'ল "আচ্ছা, কোনও ঠগ বেশ কিছুটা হিন্দি, অল্প একটু বাংলা, আর বেশ কিছু নেতাজীর তথ্য মুখস্থ করে কিছু ভারতীয়কে ঠকাবার জন্য এই নির্জন মন্দিরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো! নেতাজীর ভক্ত ঠকিয়ে কটা ইয়েনই বা লুটতে পারে? ঠগদের পক্ষে প্রচন্ড লাভের ক্ষেত্র এটা নয়। তবু মন মানে না। নাঃ, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি! অথচ উনি যে সেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রিত অতিথি সেটা তাঁর উচ্চমানের স্যুটবুট দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হয়তো সত্যিই এটা দৈব যোগাযোগ? মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল "চলো তো, তারপর দেখা যাবে।" শত হলেও সে একা বুড়ো আর আমরা দুজন। ব্যস্, বলে বসলাম, "চলুন"।

ট্যাক্সি আমাদের নানা অলিগলি দিয়ে নিয়ে গেল ডকুশো-নো-মোরি পার্কে। নেগেশী-সান গল্প করেই চলেছেন। শেষে ট্যাক্সিভাড়াও কিছুতেই দিতে দিলেন না। ধন্যবাদ দিতে গেলেও উনিই যে এই সুযোগ পেয়ে ধন্য হলেন সেটাই বলছেন বারে বারে। ইনি আমাদের খুব উন্নতমানের দেশপ্রেমী ভাবছেন, অথচ সেই সন্মানের একেবারেই যোগ্য নই আমরা। আকাশের আর দোষ কী? দোষী একা আমি। এমনকি চেহারাটাও যে বাঙালি তাও ভুলে যাই, কী লজ্জা!

নিরিবিলি এই পার্কে অদ্ভুত একটা সুন্দর অনুভূতিতে মনটা ভরে গেল। গাছে ঘেরা একটা জায়গায় গান্ধীর মূর্তি আর তাঁর

বাণী খুব সম্মানের সাথে স্থাপনা করা হয়েছে। তার পিছনেই সেই সেন্ট্রাল লাইব্রেরী যেখানে একটা উইং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়েছে।

ইংরেজি আর জাপানী বইয়ের মাঝে নেগেশী-সান দেখালেন শো-কেসে নেতাজী সম্বন্ধে বই, মলাটে "চলো দিল্লী" জাপানী হরফে লেখা। ওঁর উৎসাহ তখন একটা ছোট ছেলের মতন। এদিকে দুপুর গড়াতে শুরু করেছে। এত উত্তেজনাতেও ক্ষিদে যে পায়নি তা নয়। নেগেশীবাবু বললেন কাছেই নাকি

একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁ রয়েছে। গেলাম এই শর্তে যে আমি খাওয়াব। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর অবশেষে তিনি রাজী হলেন। খেতে খেতেও নেতাজীরই চর্চা করছি। লজ্জা পাচ্ছি যে আমি নেতাজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করলেও তাঁর সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি। আমার মায়ের তিন মাসতুতো দিদি আই-এন-এর রানী অব্ ঝাঁসী রেজিমেন্ট-এ লক্ষ্মী সহগলের (তখন স্বামীনাথান) সঙ্গে ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে কোনও এক সময় লক্ষ্মীজীর সাথে দেখাও করেছি, আর একবার কৃষ্ণা বসু ও শিশির বসুর সাথে একটু কথা গল্প। কিন্তু ওই অবধিই। বরং আমার বিশেষ এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন যার পরম শ্রদ্ধা দেখে টের পেয়েছিলাম যে আমরা বাঙালিরা ঠিকমতো নেতাজীকে শ্রদ্ধা করতে শিখিনি। আমার বন্ধু শেহবাজ হাসান সাফ্রানীর কাকা হলেন স্বয়ং আবিদ হাসান যিনি সাবমেরিনে নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন। আমি সেই শেহবাজের মধ্যে দেখেছি নেতাজীর প্রতি এই নেগেশী-সানের মতন গভীর সম্মান। কাকার মুখে গল্প শুনে শেহবাজ হাসান সাফ্রানীর সারা জীবন চিরকালের মতন প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল। আমার সামনে নেগেশী-সান বসে যখন বলছেন যে আজও তাঁর পরিবার একটা দিনও নেতাজীর কথা না ভেবে কাটায় না, তিনি যেন সর্বসময় তাঁদের জীবনে রয়েছেন, এমনকি তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছেও তাই, তখন নিজেকে খুব অযোগ্য মনে হ'ল, বাঙালি হিসেবে। গতকাল ইয়োকোহামার রেঙ্কোজি মন্দিরের সন্ন্যাসী আমাদের "ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ট" বলে সম্বোধন করেছিলেন চিঠিতে – সেটা ভেবে লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম। আমরা ক'জন নেতাজীর প্রেরণায় চলি জীবনের প্রতিটি দিন? আর এই ভদ্রলোক তো নিজেও নেতাজীকে দেখেননি। শুধু তাঁর বাবা সান্নিধ্য পেয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। কীরকমভাবে সেই সূর্যের মতন ব্যক্তিত্ব, যার সঙ্গ পেয়ে একটা গোটা পরিবারের তিনটে প্রজন্ম তাঁর স্মৃতিতে প্রতিদিন বিভোর থাকতে পারে?

টোকিওতে বসে ভারতীয় খাবার খেতে খেতে আর নেতাজীর স্মৃতিচারণ করতে করতে আয়াপ্পান পিল্লাই মাধবন নায়ারের কথা না তুললেই নয়। খুব ছোট্ট থাকতেই দেশে স্বাধীনতার রাজনৈতিক স্রোত তাঁকে টানত। আঠারো বছর বয়সে কেরালায় দেশাত্মবোধক কাজে রীতিমতন জড়িয়ে পড়েন তিনি। এদিকে অর্থবান বাবা পড়লেন মহা চিন্তায়। ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধিতা করবার কোনও ইচ্ছে তাঁর নেই। এই সমস্যার সমাধান করতে ১৯২৩শে উনি ছেলেকে পাঠিয়ে দেন সুদূর কিওতো শহরে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কিন্তু কপালও যে সঙ্গে গেল সেটা জানা গেল পরে। তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেশ কিছুদিন চাকরিও করলেন।

এদিকে রাসবিহারী বোসও তখন জাপানে বহু বছর ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করবার অপেক্ষায়। তারপর নেতাজীর আগমন হতেই এই মিস্টার নায়ার বা নায়ার-সান তাঁর পিতৃআজ্ঞা জলাঞ্জলি দিয়ে নেতাজীর দোভাষী হিসেবে বহাল হয়ে গেলেন। চলতে লাগল দেশ স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৪৫-এর জানুয়ারীতে রাসবিহারীর মৃত্যু আর তারপর অগাস্টে নেতাজীর বিতর্কিত প্লেন দুর্ঘটনা যা ভারতীয়রা কোনদিন মেনে নিতে পারেননি। নায়ারের তারপর আর নতুন করে কোনও আন্দোলনে যোগ দেওয়া হয়নি। দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসেবে একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ খোলেন টোকিওর নামকরা গিঞ্জা অঞ্চলে। সেটা এখনও চলছে, তাঁর ছেলের তত্ত্বাবধানে।

সন্ধ্যে নেমে এল। জাপানের কুখ্যাত অফিসের ভীড় শুরু হয়ে গেছে। আমরা কাছের ট্রেন স্টেশন অবধি গল্প করতে করতে গেলাম। 'সুইকা' কার্ড সোয়াইপ করে ঢুকে পড়তে যাব, এমন সময় নেগেশী-সান একটু ইতস্তত করে বললেন, "যদি খুব তাড়া না থাকে, তাহলে আরও দুমিনিট সময় দিতে পারবেন? আপনাকে আরেকটা জিনিস না দেখালেই নয়"। আরও বাকি আছে দেখবার? হ্যাঁ, আর সেটা নাকি এই স্টেশনেই আছে। কৌতূহল বেড়ে উঠল। এই আধুনিক মল-মার্কা চারতলা ট্রেন-স্টেশনে ভারতীয় ইতিহাসের কীই বা থাকতে পারে? লিফ্টে করে আমাদের নিয়ে গেলেন চারতলায়। নানা ঝকঝকে দোকান পেরিয়ে একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, "চিনতে পারছেন এঁদের?" আমি কিছু বলার আগেই উনি বললেন, "বিহারী বোস। জাপানীদের মশলা দিয়ে স্বাদের রান্না করতে ইনিই শেখান।"

কারণটা জানা নেই, তবে জাপানীরা নেতাজীর এবং রাসবিহারী বোসের নামের প্রথম অংশটা বলেন না। শুধু চন্দ্র বোস আর বিহারী বোস।

সত্যিই তো, জাপানী স্ত্রীর সাথে রাসবিহারী বোসের সিপিয়া-টিন্টের ছবি রেস্টুরেন্টের শো-কেসে নানারকমারী খাবারের মডেলের পাশে সাজানো।

১৯১৫ সালে রাসবিহারী বোস জাপানে এসে কাঁচা মাছ আর সেদ্ধ মাছ খেতে খেতে ভাবলেন এঁদের মশলা দিয়ে কালিয়া বানাতে না শেখালেই নয়। নইলে এদেশে থাকাই মুশকিল হবে। শুনেছি রন্ধনশিল্পে নাকি দারুণ পারদর্শী ছিলেন তিনি। তাই, নিজের রসনার তাগিদেই স্ত্রী, শ্যালক, শ্বশুর, শাশুড়ি সবাইকে শিখিয়ে দিলেন বাঙালি রাঁধুনির কলা-কৌশল। তাঁদের ছিল খাবারেরই ব্যবসা। তাই সহজেই তাঁদের রেস্তোরাঁর মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল সেই কারী-ঝোলের সুনাম। এখনও ওখানে "কারে-রাইসু" খুবই পপুলার একটা রেসিপি।

নীচে নেমে এসে এবার সত্যি সত্যি বিদায় জানাবার পালা। সারা স্টেশনে দ্রুতগতিতে মানুষ দিগ্বিদিকে চলেছে চুপচাপ, সেলফোন হাতে। ওই ভীড়ের মধ্যেও দেওয়াল ঘেঁষে একটু নিরালা পেয়ে উনি আঙুল দিয়ে তাঁর জুতোদুটোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আর গেয়ে উঠলেন, "মেরা জুতা হ্যায় জাপানী", প্যান্ট দেখিয়ে, মুচকি হেসে বললেন, "পাতলুন ইংলিশস্তানী"। মাথায় টুপী না থাকলেও, "সির পে লাল টোপী রুশী"। এবার আসল কুর্নিশের সাথে, "ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানী"। আমার তখন সুযোগ্য ধন্যবাদ দেওয়ারও আর ক্ষমতা নেই। দুই তরফের কিছু কুর্নিশের পরে আমাদের এগিয়ে চলতেই হ'ল। সারা জীবনের মতন একটা দিন কাটল বটে। কী করে যে অন্যদের এই অভিনব দিনের কথা বলব তখন কল্পনা করতে পারছি না। ওই আমলের মানুষ কমে আসছে পৃথিবীতে। আমি যে হঠাৎ করে কারুর এইরকম সান্নিধ্য পাব সে কি কোনোদিন জানতাম? ফেরবার পথটা ভাবের ঘোরে কেটে গেল। তখন বারো বছরের ছেলেই চলনদার।

জীবনের কাজকর্মের চাকা আবার ঘড়ঘড় করে চলেছে। মিস্টার নেগেশীর সাথে আর যোগাযোগ হয়নি। তাঁর দেওয়া কার্ডের ইমেইল আর ফোনে যোগাযোগ করে কোনও সাড়া পাইনি। টোকিওর মানুষের ঢেউয়ে উনি যেন আবার হারিয়ে গেলেন। এখন গুগুলের কল্যাণে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি, এমনকি নেতাজীর সাবমেরিন সফরের ভিডিওটাও ইউটিউবের কল্যাণে দেখা হয়েছে। সাবাংদ্বীপে জেনেরাল ইয়ামামোতোর সাথে আদৌ কোন মিস্টার নেগেশী ছিলেন কিনা দোভাষী হিসেবে, তা সঠিক জানতে পারিনি। তবু ভাবতে ইচ্ছে করে যে সেদিন ভদ্রলোক যা বলেছিলেন তার সবটাই সত্যি; শুধুমাত্র দুজন ভারতীয় পর্যটকের মনোরঞ্জনের জন্য বানানো কিছু মিথ্যে গল্প নয়। ভারতের প্রতি, নেতাজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নির্ভেজাল ছিল, দেখে মনে হয়েছিল তাঁর অন্তঃকরণও যেন সেরকমই।

নেতাজীর অনবদ্য জীবন, তাঁর জীবনদর্শন, নতুন করে আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে যে ইতিহাসের বিতর্ক, তাতে আমার স্বাদ লাগে না। ছোটবেলায় নেতাজীর আকস্মিক ফিরে আসবার সম্ভাবনায় যদিও মনটা উতলা হয়ে থাকত। আমার কাছে তাঁর জীবনদর্শনই সবথেকে মূল্যবান। তাঁর মৃত্যু নেই।

হিউস্টনের বাড়িতে ফিরে মিস্টার নেগেশীর ফোন নম্বরে চেষ্টা করে নাগাল পাইনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার বলেছিলেন উনি সুমো রেসলিং দেখবার গাইড। হয়তো আশাও করেছিলেন আমরা সপরিবারে সেই কুস্তির শো দেখতে যাব। সে পথ আমার নয়। আর ফোনও উনি তোলেননি। আমার কাছে সেই থেকে তিনি রয়ে গেছেন নেতাজী-প্রীতির এক রহস্যময় প্রতীক হয়ে। আর অভিজ্ঞতাটি রয়ে গেছে এক অনবদ্য উপহার হিসেবে।

{এই লেখাটি ২০১৫-র শারদীয় ভ্রমণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। খুব সামান্য অদলবদল আছে এই অনুলিপিতে।}

বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত কলেজের নব রূপায়ক

অদিতি ঘোষদস্তিদার

সংস্কৃত কলেজ আর বিদ্যাসাগর – এ নিয়ে পুরোটা লিখতে গেলে বোধহয় আর একটা মহাভারত রচনা হয়ে যাবে। ছাত্র থেকে প্রিন্সিপাল – এক অনন্য দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।

এই প্রবন্ধে মূলত আলোচনা করব সংস্কৃত কলেজের উন্নতিতে বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা। তবুও একটু গোড়া থেকেই শুরু করি।

১৮০০ সালের প্রথমদিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নেন, উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা। সরাসরি ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষা দিলে হয়তো জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে – সেই ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।

রাজা রামমোহন রায় ব্যাপারটা একেবারেই মেনে নিতে পারলেন না। সংস্কৃতের মতো কঠিন ভাষাকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চিন্তা তাঁর কাছে বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ল না। মতামত জানিয়ে চিঠি দিলেন শিক্ষা দপ্তরে। কিন্তু রামমোহন নিজেই তখন সমাজে প্রবলভাবে বিতর্কিত, বলতে গেলে প্রায় ব্রাত্য। তাই বৃহত্তর হিন্দু-সমাজকে চটাতে বোধহয় অরাজি হলেন ভারত সরকার। ইংরেজি শিক্ষা সংস্কৃত কলেজে চালু হ'ল না। ভারত-ভাগ্যবিধাতা বোধহয় তখন অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছিলেন।

১৮২৯ সালের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্র ন'বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। সাকুল্যে বারো বছর পাঁচ মাস ছাত্রজীবন। অসাধারণ মেধার জোরে কলেজের গণ্ডি পেরনোর আগেই বিদ্যাসাগর উপাধি। ছাত্রাবস্থাতেই আর একটি পালক মুকুটে। অত্যন্ত কঠিন হিন্দু আইন পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ। কলেজের পরীক্ষায় পাস করার পর প্রথম চাকরি মিলল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। মার্শাল সাহেব তখন সেই কলেজের সেক্রেটারি। ঈশ্বরের জ্ঞানের গভীরতায় সাহেব মুগ্ধ। গভর্নমেন্টের সেক্রেটারির কাছে নিজেই সুপারিশ করলেন। সেরেস্তাদার বা প্রথম পন্ডিতের পদে কর্মজীবন শুরু হ'ল ঈশ্বরের।

বছর পাঁচেক কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদটি শূন্য হতে সেখানে আবেদন করলেন বিদ্যাসাগর। মার্শাল সাহেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে দিলেন রেকমেন্ডেশন লেটার। সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দিলেন বিদ্যাসাগর। শুরু হ'ল নতুন অধ্যায়।

এই সময়ের একটা ঘটনা –

বিদ্যাসাগর কোন একটা দরকারে হিন্দু কলেজে গেছেন। কার সাহেব তখন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল। বিদ্যাসাগরকে তিনি সামান্য সৌজন্যটুকুও দেখালেন না। বসতে বলা তো দূরের কথা, বরং নিজে চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলে পা তুলে বসে থাকলেন। কাজ সেরে বেরিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। এই অপমানের বিরুদ্ধে একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না।

দিন কয়েক পর কার সাহেব কোন একটি কাজে সংস্কৃত কলেজে আসায় বিদ্যাসাগর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। চটিজুতা সমেত পা টেবিলে তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। কার সাহেব তো চটে লাল। নালিশ গেল শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ময়েট সাহেবের কাছে। ময়েট সাহেব শো কজ করলেন ঈশ্বরকে। প্রখর বুদ্ধিধর ঈশ্বর সবিনয়ে জানালেন অসভ্য ভারতবাসী হয়ে সঠিক সভ্য আচরণবিধি তাঁর সঠিক জানা ছিল না, তাই ভেবেছিলেন কার সাহেবের আচরণই হয়তো সভ্য জাতির অভ্যর্থনা জানাবার নিয়ম। সেইজন্যই সৌজন্য দেখাতে কার সাহেবের প্রদর্শিত পথই নিজে গ্রহণ করেছেন। ময়েট সাহেবের বুঝতে কিছু বাকি রইল না। কার সাহেবও লজ্জিত হলেন। পরে সাহেব নিজেই কথা বলে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটান।

কাজ শুরু করেই ঈশ্বর দেখলেন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার পরিবেশটি একেবারেই প্রায় তলানিতে। শিক্ষকরা বেশিরভাগই ক্লাসে এসে ঘুমোন। কোন কোন শিক্ষক আবার ছাত্রদের বাধ্য করেন ঘুমোবার সময় পাখার বাতাস করতে। শিক্ষক এবং ছাত্রদের আসা যাওয়ার সময়েরও কোন ঠিক নেই। চরম বিশৃঙ্খলা।

২৬ বছরের যুবক বিদ্যাসাগর পূর্ণ উদ্যমে কঠোরভাবে হাল

ধরলেন | নিয়ম জারি হ'ল, সাড়ে দশটার মধ্যে সব ছাত্র এবং শিক্ষককে কলেজে উপস্থিত হতে হবে | সেক্রেটারির অনুমতি ছাড়া যখন তখন কলেজ ছেড়ে যাওয়া চলবে না | ছাত্রদের জন্যে কাঠের পাসের ব্যবস্থা চালু হল, সেই পাস নিয়ে এক একজন করে ছাত্র কিছু সময়ের জন্য বাইরে যেতে পারে |

ধীরে ধীরে অবস্থা আয়ত্তে আসতে লাগল | কিন্তু কাজ অনেক | শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন বিদ্যাসাগর | কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর খেটে তৈরি করলেন এক বিরাট পরিকল্পনার খসড়া | মার্শাল সাহেব সেই প্ল্যান দেখে মহা খুশি | মতামত জানিয়ে বললেন, সঠিক আইন মেনে তৈরি এই পরিকল্পনা মেনে চললে ছাত্ররা কিছু সময়ের মধ্যেই অল্প আয়াসে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠবে | পরিকল্পনাটি কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে দাখিল করলেন বিদ্যাসাগর | রসময় দত্ত কিন্তু পুরো পরিকল্পনাটি শিক্ষা দপ্তরে জমা তো দিলেনই না, বরং দাবি করলেন বাকি অংশেরও অনেকটাই নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত | সেক্রেটারির এমন কু আচরণের জন্যে কাজের মনটাই গেল নষ্ট হয়ে, হতাশ বিদ্যাসাগর কাজে ইস্তফা দিলেন | দীর্ঘদিন সেই ইস্তফাপত্র গৃহীত হ'ল না | বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি বারে বারে অনুরোধ করলেন কলেজ ছেড়ে না যেতে | কিন্তু বিদ্যাসাগর নিজ সিদ্ধান্তে অটল |

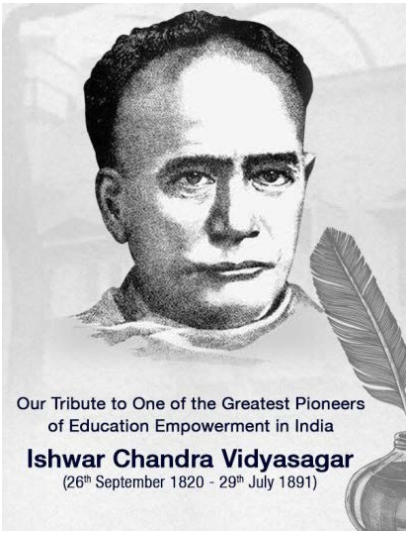

প্রসঙ্গত বলি, সেই মূল পরিকল্পনাটি এখনও সংস্কৃত কলেজের দপ্তরে সুরক্ষিত আছে |

চাকরি ছেড়ে বেশ কিছুদিন নানারকমভাবে উপার্জনের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন ঈশ্বর | তারপর বছর দুয়েক বাদে আবার যোগদান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে | এবার হেড রাইটার আর ট্রেজারার যুগ্ম পদে | সঙ্গে চলল সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র আর জুনিয়র স্কলারশিপের প্রশ্ন করা আর পরীক্ষা নেওয়ার কাজ | একা হাতে | ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকের পদটি খালি হ'ল | শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ময়েট সাহেবের কথা আগেই বলেছি | তাঁর একান্ত ইচ্ছে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে আবার ফিরে আসেন | বিদ্যাসাগরের মনে অতীতের দগদগে তিক্ত স্মৃতি | বিনীতভাবে সাহেবের কাছে আর্জি পাঠালেন, পদটি নিতে পারেন এক শর্তে, যদি তাঁকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করা হয় | ময়েট সাহেব যথা সম্ভব চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন |

১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর আবার সংস্কৃত কলেজে যোগদান করলেন সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে | নতুন করে আবার উঠে পড়ে লাগলেন কলেজের উন্নতিকল্পে | দুবছরে কলেজের অবস্থা আরও শোচনীয় | পুরনো যা যা নিয়ম তিনি চালু করেছিলেন সেসব কিছুই নেই | হপ্তা দুয়েকের মধ্যেই কলেজের বিধি ব্যবস্থার নানান পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়ে শিক্ষা দপ্তরে জমা করলেন রিপোর্ট | এই সময় কলেজের পূর্বতন সেক্রেটারি রসময় দত্ত ইস্তফা দিলেন | বিদ্যাসাগর তখন অস্থায়ী সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করতে লাগলেন | নতুন প্রস্তাব নিয়ে ভীষণভাবে আশাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র | প্রস্তাব গৃহীত হলে সংস্কৃত কলেজ একদিন সারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, মনে তাঁর এই দৃঢ় আশা | ময়েট সাহেব পরিকল্পনা আর পরিকল্পনাকার উভয়েরই উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করে দীর্ঘ পত্র দিলেন বাংলার গভর্নমেন্টকে | প্রস্তাব মঞ্জুর হ'ল | পরের মাসেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হলেন | প্রিন্সিপ্যাল হয়ে বিদ্যাসাগর পুরোপুরি ঢেলে সাজালেন কলেজকে | আগে অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি হয়ে যা যা কাজ ঠিকমত করতে পারেননি তা সম্পন্ন করতে তিনি এখন বদ্ধপরিকর |

অধ্যাপকরা যখন ইচ্ছে আসেন যান | বেশিরভাগ দিনই দেরি করে আসার জন্যে ক্লাস ফাঁকি পড়ে | ছাত্ররাও তাই নিয়মের ধার ধারে না | এভাবে চলতে পারে না | সবার আগে আনতে হবে নিয়ম শৃঙ্খলা | কাজটা অবশ্য খুব সহজ নয় | ছাত্রদের না হয় শাসন করা যাবে, কিন্তু অধ্যাপকদের? তাঁরা বেশিরভাগই আবার ঈশ্বরের শিক্ষকও | অনেক ভেবে একটা উপায় বের করলেন বিদ্যাসাগর | কোন অধ্যাপক দেরি করে আসছেন

দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, "এই এলেন বুঝি?" এই সামান্য প্রশ্নেই অধ্যাপকদের মাথা নিচু হয়ে যেত | কিছুদিনের মধ্যেই সবাই প্রায় সঠিক সময়ে আসতে শুরু করলেন | কিন্তু একজন অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কিছুতেই সময়মতো আসতে পারেন না | বয়স্ক অধ্যাপক | বিদ্যাসাগর তাঁর স্নেহধন্য, তাঁকে ছাত্রাবস্থা থেকে শ্রদ্ধা করেন | তাই একই অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধে | ঈশ্বর অনেক ভেবে আরেক রকম ফন্দি আঁটলেন | কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলেন চুপচাপ | জয়নারায়ণ ঢোকার মুখে রোজ দেখেন ঈশ্বরকে, কিন্তু মুখ দিয়ে একটিও রা কাড়েন না ঈশ্বর | বাধ্য হয়ে একদিন নিজেই কথা বলে ফেললেন বৃদ্ধ অধ্যাপক | "তুমি যে কিছু বলো না, এতেই সর্বনাশ হ'ল | প্রশ্ন করলে না হয় দেরিতে আসার একখানা কারণ দাখিল করতে পারতাম, কিন্তু এভাবে জব্দ করলে তো তারও উপায় থাকে না | যাক, মরি বাঁচি এবার ঠিক সময়ে আসব |"

এইভাবে নরম গরমে বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই কলেজে নিয়মানুবর্তিতা চালু করে দিলেন নতুন প্রিন্সিপ্যাল | সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে চারটে অবধি ক্লাসের সময়, মধ্যে দুপুর একটা থেকে দুটো খেলার ছুটি | দুটোর পর সংস্কৃত ক্লাস, ন্যায়, স্মৃতি, অলঙ্কার | তাই সংস্কৃত অধ্যাপকদের বিকেলে আবার আসতে হতো | ছাত্রদের লেখা থেকেই জানা যায়, বিদ্যাসাগর নিজে সাড়ে দশটার ঘন্টা পড়লে ঘরে ঘরে ঘুরে দেখে যেতেন সব ক্লাসে শিক্ষক এসেছেন কিনা | একই কাজ আবার করতেন দুটোর সময়, খেলার পর | কলেজে প্রিন্সিপ্যালের গম্ভীর মূর্তি | দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার হাঁক পাড়লেই চারদিকে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যেত | কিন্তু কলেজের বাইরে একদম অন্য চেহারা | একদিন কী একটা কাজে আটকে পড়ে দেরি হয়ে গেছিল বিদ্যাসাগরের | সময় কষে দেখলেন যে বাসায় ফিরে গিয়ে কলেজে আসলে অনেক দেরি হয়ে যাবে | পথেই ছিল ছেলেদের হস্টেল; ঢুকে পড়লেন | ছাত্রদের কাছ থেকে একখানা ভিজে কাপড় চেয়ে চান করে, ছাত্রদের সঙ্গেই খেতে বসে গেলেন | সঙ্গে গল্প হাসি ঠাট্টা | জাত ধর্ম নির্বিশেষে সকলের পাত থেকে এক এক থাবা ভাত তুলে নিলেন | তারপর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে সবার আগে পৌঁছে গেলেন কলেজে | এই একাধারে কঠোর অথচ অন্যদিকে স্বচ্ছ কোমল ভাবমূর্তির প্রভাবে ছাত্ররা অল্পদিনের মধ্যেই প্রিন্সিপ্যালের গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিল | উপযুক্ত শিক্ষা আর প্রয়োগের সবরকম সুবিধা যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর ছাত্ররা পেতে পারে তার জন্য বিদ্যাসাগর প্রিন্সিপ্যাল হয়েই তৎপর হলেন | একের পর এক পদক্ষেপ | সংস্কৃত কলেজে তখন পড়ার অধিকার ছিল কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যদের | বিদ্যাসাগর কায়স্থ ছাত্রদের পড়ার ব্যবস্থা করলেন | হিন্দু কলেজ আর মাদ্রাসার কৃতী ছাত্ররাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের জন্য মনোনীত হতো, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ছিল সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত | আবেদন জানালেন শিক্ষা পরিষদে | ক্রমে আলাপ আলোচনার পর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরও ডেপুটি হবার অধিকার মিলল |

১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় | ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে এসেছে, আবার চলে গেছে | কখনো তারা কিছু ক্লাস করেছে আবার কিছুদিনের জন্যে বেপাত্তা | কলেজের হাজিরা খাতায় একবার নাম ওঠে আবার চলে যায়; তাই ছাত্রসংখ্যা বা তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সম্যক ধারণা করা খুবই অসুবিধার | কিন্তু ছাত্রদের কিছু যায় আসে না | কারণ পয়সাকড়ি দেবার বালাই নেই | এভাবে কলেজের মান বা শৃঙ্খলা কিছুই বজায় থাকছে না দেখে বিদ্যাসাগর ভর্তি ফি-র ব্যবস্থা করলেন | মাথাপিছু দু'টাকা | নিয়ম চালু হ'ল যে ভর্তি হতে দু'টাকা লাগবে, দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে হাজিরাখাতা থেকে নাম কাটা যাবে | নাম কাটার পর ক্লাসে আসতে গেলে আবার ভর্তি ফি দিতে হবে | নিয়ম চালু হতেই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এল অনেকটা |

সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার জন্য সেকালে একটিই বই, ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ | অত্যন্ত কঠিন | শিক্ষা জীবনের শুরু

থেকেই এই বই থেকে ব্যাকরণ শেখা অধিকাংশ ছাত্রদের কাছেই দুরূহ, তাই যথেষ্ট সময় আর পরিশ্রমের বিনিময়েও আশানুরূপ ফল মেলে না | ছাত্রদের এই অসুবিধার কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করে বিদ্যাসাগর নিজেই বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ আর উপক্রমণিকা লিখে ফেললেন | ছাত্ররা এরপর থেকে প্রায় অনায়াসেই সংস্কৃত ক্লাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি পেতে শুরু করে|

সংস্কৃতর পাশাপাশি ইংরেজিও শিখতে হবে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে সঠিক শিক্ষা হবে না | অনেক পরিকল্পনা বিদ্যাসাগরের| তার জন্যে লাগবে অনেক টাকা| চিঠি লিখলেন কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে | কাউন্সিল কলেজ পরিদর্শনের জন্যে পাঠালেন কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সাহেবকে | সাহেব রিপোর্ট জমা দেবার পর সেই কাগজপত্র বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠান হ'ল| তিনি দেখলেন তাঁর অনেক মতামতই গ্রাহ্য হয়নি| বিদ্যাসাগর জন স্টুয়ার্ট মিলের লজিক ও পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন পড়ানোর ওপর জোর দেন | ব্যালেন্টাইন মত দেন বার্কলের দর্শন পড়ানোয় | তীব্র মতবিরোধ| আধুনিকতা বনাম প্রাচীন পন্থা | ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগর আবার চিঠি লিখলেন দপ্তরে | প্রবল যুক্তি দিলেন নতুন পাঠ্যক্রমের সপক্ষে | এবার কাউন্সিল জানালেন এই ধরনের বিষয় শিক্ষা দেবার উপযুক্ত আধুনিক শিক্ষকের খুবই অভাব| অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর জানালেন তিনি নিজেই যথেষ্ট সক্ষমভাবে ইংরেজি এবং সংস্কৃত দুই ভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে পারবেন| বিদ্যাসাগরের সুতীক্ষ্ণ যুক্তি আর বুদ্ধির সামনে কাউন্সিল অফ এডুকেশন তথা ব্রিটিশ সরকার পিছু হটতে বাধ্য হ'ল| নিজের পরিকল্পনামতো উপযুক্ত পাঠ্যক্রম গড়ে তুলতে শুরু করলেন বিদ্যাসাগর | ইংরেজি হ'ল অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়| এতদিনে রামমোহনের সুপ্ত বাসনা পূরণ করলেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী| সংস্কৃতে লেখা ভাস্করাচার্যের অঙ্কের বই বাতিল হয়ে এল ইংরেজিতে লেখা অঙ্কের বই, সহজভাবে ব্যাখ্যা করা সেই বইগুলি ছাত্রদের অঙ্ক আর বিজ্ঞান শেখার আগ্রহ অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল| নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করলেন অভিভাবকরা| কলেজের ছাত্রসংখ্যা হু হু করে বাড়তে লাগল|

সংবাদ প্রভাকর লিখল, "বিবিধ বিদ্যা বিশারদ পন্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কলেজের প্রিন্সিপালের পদে অভিষিক্ত হওয়া অবধি তথাকার ছাত্রদিগের শিক্ষার আতিশয্য ও নিয়মাদি উৎকৃষ্ট হইতেছে, একারণে শিক্ষা সমাজের মেম্বারগণ এবং গভর্নর জেনারেল সাহেব তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন|"

নতুন নতুন চিন্তায় যেসব নিয়ম বিদ্যাসাগর কলেজে চালু করেছিলেন, তা আজ এই আধুনিক যুগেও একইভাবে মানা হয় | কলকাতার তীব্র গরমের হাত থেকে ছাত্রদের বাঁচাতে চালু করেন গ্রীষ্মের ছুটি | সবচেয়ে মজার ব্যাপার আজকাল যেমন বড় বড় কলেজ ইউনিভার্সিটিতে জিম বা ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা আছে, সেই যুগে কলেজেই কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামের ব্যবস্থা শিক্ষকদের জন্যে করেছিলেন বিদ্যাসাগর | কমবয়সী শিক্ষকরা যেমন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারসহ বিদ্যাসাগর নিজেও কুস্তি করতেন| শোনা যায় অধ্যাপকরা সকলেই এই ব্যবস্থায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন| অসুস্থতার জন্য শিক্ষকদের ক্লাস কামাই প্রায় হতো না বললেই চলে| নতুন পাঠক্রম চালু করার কিছু বছরের মধ্যেই ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলে অসামান্য সাফল্য চোখে পড়ল| আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্ররা কলেজের মুখ উজ্জ্বল করতে লাগল | সংস্কৃত কলেজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল | বিদ্যাসাগরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকল সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে|

বিদ্যাসাগরের এই বিরাট কর্মযজ্ঞকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তিনি (বিদ্যাসাগর) পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন... তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের দিগবিরোধ নেই| তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথচ বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন|"

তথ্যসূত্র ও ঋণ স্বীকার:

১) করুণা সাগর বিদ্যাসাগর: ইন্দ্রমিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৯

২) Isvar Chandra Vidyasagar: A Story of His Life, Subal Chandra Mitra, New Bengal Press, 1902

৩) বিদ্যাসাগর: গোলাম মুরশীদ সম্পাদিত, শোভা প্রকাশ, ১৯৭০

মহানিষ্ক্রমণ

সংগ্রামী লাহিড়ী

নেতাজি ভবনে রাখা Wanderer গাড়িটা দেখে কিশোর শুভ খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল। কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে যত্ন করে রাখা আছে কালো রঙের সেডান। নম্বর প্লেটে লেখা BLA 7169 – দেওয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুভ

দেখছে গাড়িটাকে।

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ডিসেম্বরের ছুটিতে কলকাতায় এসেছে শুভ। বাবা-মার সঙ্গে। বছরের শেষ দিকটায় কাজের চাপ কম, স্কুলে ছুটি। কলকাতার মিষ্টি ঠান্ডায় দাদু-দিম্মার আদরে হু হু করে সময় কেটে যাচ্ছে। দিম্মাই একদিন কথাটা তুললেন। এলগিন রোডের নেতাজি ভবনে শুভকে নিয়ে একটা দিন কাটিয়ে এলে কেমন হয়? শুভর খুব উৎসাহ। দাদুর কাছেই তার নেতাজির কথা জানা, নেতাজিকে নিয়ে বই পড়া। সেই নেতাজির বাড়িটা নিজের চোখে দেখা যাবে? এও কি সম্ভব?

"কেন নয় শুভ?" দিম্মা বললেন। "এলগিন রোডের সেই বাড়ি কলকাতার বুকে এক তীর্থক্ষেত্র, দেখবি তো বটেই। চল, কালই যাওয়া যাক।"

দাদু এক কথায় রাজি। তাই আজ সবাই মিলে সকাল সকাল চলে এসেছে নেতাজি ভবনে। নেতাজির সঙ্গে, বসু পরিবারের সঙ্গে সারাটা দিন কাটবে। ঢোকার মুখেই সেই বিখ্যাত গাড়ি। দেখেই শুভ উত্তেজিত, "দাদু, এই সেই গাড়ি?"

সে জানে, বইতে পড়েছে ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষের কলকাতা ছেড়ে যাবার কাহিনী। দাদুই বই পাঠিয়েছেন। শৈলেশ দে-র লেখা 'আমি সুভাষ বলছি', শিশির বসুর লেখা বই 'মহানিষ্ক্রমণ'। যে যাওয়া ছিল তাঁর শেষ যাওয়া, আর কখনো ফিরতে পারেননি মাতৃভূমিতে।

দ্বিতীয় বইটার নাগাল পাওয়া শুভর পক্ষে শক্ত, কিন্তু সে হাল ছাড়েনি, একটু একটু করে পড়ছে, ভাবছে। বোঝার চেষ্টা করছে সেই সময়ের প্রেক্ষাপট। দাদু তো আছেনই। দুজনের মধ্যে দুই মহাদেশের ব্যবধান, কিন্তু মনের বড্ড কাছাকাছি। শুভর মনন যে দাদুর হাতেই গড়া।

১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারির রাত দেড়টা। কোনো এক মহম্মদ জিয়াউদ্দিন Wanderer গাড়িটির প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসলেন। স্টিয়ারিং-এ শিশির বসু, শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র। গাড়িটিও তাঁরই, বছর চারেক আগে কেনা। গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। শুরু হ'ল সমকালীন যুগের এক অবিশ্বাস্য যাত্রা। শুধু দেশের জন্যে, দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্যে এক অসমসাহসের কাহিনী।

"শুভ, মিউজিয়াম দেখবি না?" দিম্মার ডাকে সম্বিৎ ফেরে।

"যাব দিম্মা। একটু পরে।"

দাদু বুঝেছেন শুভর ভেতরের আলোড়ন, ইতিহাস যাপন করছে সে। বসলেন তাকে নিয়ে সামনের বেঞ্চে। বলতে শুরু করেছেন, "কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। অনেকদিন ধরেই নেতাজি উপায় খুঁজছিলেন। উনিশ'শ উনচল্লিশ সালটা সুভাষের জন্যে খুব ঘটনাবহুল বছর।"

"জানি, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হলেন সুভাষ, মহাত্মা গান্ধীকে হারিয়ে।"

"হ্যাঁ রে। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গেই মতের মিল হ'ল না। কংগ্রেসের সভাপতিত্বও করা হ'ল না। ইংরেজরা তাঁকে দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে জেলে পুরে দিল।"

"সেখানেই তিনি অনশন শুরু করলেন, তাই না?"

"ঠিক বলেছিস শুভ। ইংরেজরা ভয় পেল, তাঁর মতো তুমুল জনপ্রিয় নেতার ভালমন্দ কিছু একটা হলে জনতা খেপে যাবে, সামলানো দায় হবে। তাই ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই সুভাষকে

জেল থেকে ছেড়ে দিল। বাড়িতেই তিনি গৃহবন্দী। এলগিন রোডে কড়া পাহারা বসল। খৈনি টিপতে টিপতে সাদা পোশাকের পুলিশ শ্যেনদৃষ্টিতে নজর রাখল এই বাড়ির দিকে। ডজনখানেক গুপ্তচর ভালমানুষের মতো মুখে জনতার সঙ্গে মিশে গেল। বাড়িতে কী হচ্ছে, কে আসছে, কে যাচ্ছে – সব তাদের নখদর্পণে।"

বিস্ময়ের সঙ্গে শুভ চারপাশটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এই রাস্তায় ঘুরত গুপ্তচর? ওই যে দূরে পানের দোকান, ওখানে পুলিশ বসে পাহারা দিত? কল্পনা তার বাধা মানে না।

দাদু বলে চলেন, "এদিকে বাড়ির মধ্যে সুভাষ তাঁর প্ল্যানিং শুরু করলেন ভাইপো শিশির বসুর সঙ্গে। পুলিশ আর গুপ্তচরের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কলকাতা ছেড়ে, অবিভক্ত ভারত ছেড়ে যাবেন সোজা আফগানিস্তানে। আফগানরা স্বাধীন, রাজধানী কাবুলে অনেকগুলি দেশের দূতাবাস। তাদের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে সাহায্য দরকার।"

"শুধু ভাইপো নয়, ভাইঝিটিও কম যেতেন না। সুভাষের ডানহাত ছিলেন। জানো কি?" এবার দিম্মা হাল ধরেছেন।

"পড়িনি তো দিম্মা? বলো না তাঁর কথা।"

"নেতাজির সেজদাদা সুরেশ চন্দ্র বসুর মেয়ে ইলা, ইলা বসু। রাঙাকাকাবাবুর সর্বক্ষণের সঙ্গী। নেতাজি খুব খারাপ জ্বরে পড়লেন। ইলাই তাঁর প্রধান সেবিকা, সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ করে তুললেন। তখন থেকেই ইলা তাঁর ছায়াসঙ্গী, তাঁর 'প্রিন্সিপাল প্রাইভেট সেক্রেটারি'। সবার চোখে ধুলো দিয়ে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পালাবার প্রধান সহায়।"

"খুব সাহসী মেয়ে ছিলেন, না দিম্মা?"

"শুধু সাহস দিয়ে হয় না শুভ, চাই উপস্থিত বুদ্ধি। সুভাষ যখন আফগানিস্তানে যোগাযোগের সূত্রগুলি নিয়ে ব্যস্ত, ইলা নিলেন ঘরের দায়িত্ব। কাউকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে দেওয়া যাবে না। সুভাষের মা প্রভাবতীও জানেন না। প্রস্তুতি চলছে। নেতাজির জামাকাপড় আলাদা করে রাখলেন। বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকা এল। দু'শিশি আয়ুর্বেদিক ওষুধও কেনা হ'ল। সব জিনিসে ইলা 'ছয়' নম্বরটি লিখে দিলেন। কেন বল দেখি?"

"আন্দাজ করে বলি দিম্মা? নেতাজি ছিলেন ভাই বোনদের মধ্যে ষষ্ঠ, তাই কী?"

"তুখোড় বুদ্ধি তোর শুভ। ঠিক ধরেছিস। বেডিং বাঁধা হ'ল। বেশ কিছুদিন আগে থেকে সুভাষ দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিলেন, বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ; মৌনব্রত। ইলা যেতেন খাবার পৌঁছাতে। দরজার ফাঁক দিয়ে খাবারের থালা গলিয়ে দিতেন। খাওয়া হয়ে গেলে ফাঁকা থালা নিয়েও আসতেন। মা প্রভাবতী তো চিন্তায় ব্যাকুল। সুভাষ কি তবে আবার সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? এই ছেলেটা তাঁর বরাবরের বাউন্ডুলে, বিবাগী।"

"সে তো ঠিকই, সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর নেতাজির বরাবরের টান ছিল, ছেলেবেলায় তো একবার সাধু হয়ে বেরিয়েও গিয়েছিলেন।" শুভ সায় দেয়।

"সেটাকেই এবার কাজে লাগানো হ'ল। কেউ সন্দেহ করবে না।" দাদু এবার মুখ খুললেন। "দাদা শরৎ বসু বলে দিলেন, 'পালানোর দিনে এমন কিছু ঘটবে না যা রোজ ঘটে না। এক্কেবারে আর পাঁচটা দিনের মতোই হতে হবে এই বিশেষ দিনটিকে।' এই সূত্র মেনে আড়াই মাস ধরে রোজ রাতে শিশির বসু নিজের গাড়িটি চালিয়ে এলগিন রোডে আসতেন। পাহারাদার পুলিশ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'রাঙাকাকাবাবুকে রেডিও শোনাতে আসি। অসুস্থ মানুষ, ট্রানজিস্টর টিউন করতে পারেন না। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবর শোনা চাই। তাই তো আমায় রাতবিরেতে আসতে হয়'।"

"বাব্বা, কী বুদ্ধি, দাদু?"

"বুদ্ধি না থাকলে এমন নিখুঁত একটা প্ল্যান কখনো করা যায়? কতখানি আগাম ভেবে রেখেছিলেন সুভাষ যে শুনলে অবাক হবি। তিনি না থাকার সময় যদি তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে চিন্তা করে ইলার কাছে কয়েকটা চিঠি রেখে গেলেন, সম্ভাব্য সাক্ষাৎপ্রার্থীর জন্যে। শেষে এল সেই দিন। ষোলোই জানুয়ারির মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ফ্লাস্কভর্তি কফি নিয়ে ইলা এসে দাঁড়ালেন। ইলার কপালে চুমু খেয়ে 'গড ব্লেস ইউ' বলে এলগিন রোড থেকে বেরিয়ে এলেন মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন। চাপ দাড়ি, মাথায় ফেজ, অভিজাত মুসলিমের পোশাক। স্টিয়ারিং-এ শিশির বসু। শরৎ বসু নিজের উডবার্ন পার্কের বাড়ির ছাতে অপেক্ষা করছেন। নিচে টর্চের ঝলকানি, রাস্তা দিয়ে একটা কালো গাড়ি চলে গেল। শরৎ বসু বুঝলেন, যাত্রা শুরু হয়ে গেল।"

"এই গাড়িটা, না দাদু?" শুভর চোখ সামনে, সে যেন দেখতে পাচ্ছে স্টিয়ারিং-এ তরুণ শিশির বসু আর প্যাসেঞ্জার সিটে বসা অভিজাত মুসলিম পুরুষটিকে।

"হ্যাঁ, ইতিহাসের সাক্ষী।" দাদুও কিছুসময়ের জন্যে নির্বাক। আশি বছর পার করেও 'মহানিষ্ক্রমণ'-এর এমনই অভিঘাত। কিছুক্ষণ বাদেই শুভর খটকা লাগে, "আচ্ছা দাদু, শিশির বসু রোজ গাড়ি নিয়ে একাই আসতেন, একাই ফেরৎ যেতেন। সেই রাতে গাড়িতে একজনের বদলে দুজন মানুষ বেরিয়ে গেল। পুলিশের চোখে পড়ল না? কী করে সম্ভব? বাড়ি থেকে গাড়ি বেরোল, কেউ একবার পরীক্ষা করল না?"

দাদুর মুখ উজ্জ্বল, "তোর ভাবনাটা খুবই যুক্তিপূর্ণ, শুভ। অনেকেরই এটা মনে হয়েছে। পুলিশ কি সে রাতে যথেষ্ট সজাগ ছিল না? না কি তারা দেখেও দেখেনি? সুভাষের জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। কে বলবে কী হয়েছিল সে রাতে? অনেকেই এ প্রশ্ন তুলেছেন।"

"এগুলো কিন্তু প্রমাণিত তথ্য নয়, শুধুই সন্দেহ।" দিম্মা এবার হাল ধরেন, "আমরা বরং ফেরৎ আসি আসল কথায়। গাড়ি তো বেরিয়ে গেল, বাড়িতে ইলা কী করলেন জানিস?"

"কী দিম্মা?"

"সুভাষের ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে শুয়ে রইলেন যাতে মনে হয় সুভাষ ঘরেই আছেন।"

"উফ, দারুণ প্ল্যান!"

"টানা দশদিন ইলা খাবার পৌঁছে দিতেন সেই ফাঁকা ঘরে, নিজেই খেয়ে খালি থালা ফেরৎ আনতেন। বাড়ির দাসদাসীরাও বুঝতে পারেনি যে সুভাষ বাড়িতে নেই। দশদিন বাদে জানাজানি হ'ল, কাগজে বেরোল, 'শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু - অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ'।"

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

অপ্রত্যাশিতভাবে গৃহত্যাগ

গত রবিবার অপরাহ্ণ হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁহার বাসভবনের কক্ষে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি দিবারাত্র এই কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

সকলেই ইহা অবগত আছেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত কয়েক-

"ততদিনে সুভাষ ভারত ছেড়ে আফগানিস্তানে ঢুকে গেছেন, তাই না?"

"সে তো বটেই। সুভাষ তখন ইংরেজদের নাগালের বাইরে।"

"এলগিন রোড থেকে কীভাবে গেলেন আফগানিস্তান? ট্রেনে?

"বলছি, শোন। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিশির বসু গাড়ি চালিয়ে সোজা গেলেন ঝরিয়ায়, অশোক নাথ বসু আর মীরা বসুর বাড়ি। বসু পরিবারেরই সদস্য। মীরা তখন তরুণী, সদ্য বিয়ে হয়েছে তাঁদের। অশোকনাথ বসুর বাংলো ছিল ঝরিয়া অঞ্চলের বারারী বলে একটা জায়গায়। খানসামা খবর দিল, শিশিরবাবু এসেছেন, সঙ্গে আবার একটি সুপুরুষ, সুবেশ, অভিজাত মুসলিম। মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন মীরাকে মুসলিম কায়দায় অভিবাদন করলেন। খাবারের ব্যবস্থা হ'ল। বাঁধাকপি খেয়ে প্রশংসা করলেন অতিথি।"

"এরকম একটা টানটান সময়ে বাঁধাকপি খেয়ে প্রশংসা? বাব্বা! স্টিলের নার্ভ একেবারে, তাই না?"

"নেতাজি কিন্তু খেতে ভালই বাসতেন।" দাদু নাক গলালেন, "শিশির বসুর স্ত্রী কৃষ্ণা বসু বিখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্করকে একবার বলেছিলেন, দেশোদ্ধার হয়ে গেলে নেতাজি নিশ্চয়ই খাওয়াদাওয়ায় আরও একটু নজর দিতেন।"

দিম্মা বলে চলছেন, "অশোক বসুর বাড়ি থেকে এবার গোমো স্টেশনের দিকে গাড়ি ছুটল। গোমো কোথায় জানিস তো? এখনকার ঝাড়খণ্ডে। অশোক ও মীরা পিছনে বসেছেন। শিশির স্টিয়ারিং-এ। মীরা তখনও সবটা জানেন না। অশোক জানেন, শিশির তাঁকে গোপনে বলেছেন। যেতে যেতে মীরাকেও জানানো হ'ল। তরুণী মীরা নির্বাক হয়ে গেলেন, এ যে অবিশ্বাস্য!"

"সে তো বটেই, আমারও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে দিম্মা। বলো, বলে যাও, থেমো না। স্টেশনে পৌঁছে গেলেন সবাই? কেউ ধরতে পারেনি তো?"

"নাঃ, কেউ তো জানেই না, ধরবে কী করে? সুভাষও অতি সতর্ক। প্রিয়জনদের বারণ করলেন, 'গাড়িতেই থাকো তোমরা, আমায় সি-অফ করার কোনো দরকার নেই।' শিশির কিন্তু শুনলেন না। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলেন যেন অন্য একজন যাত্রী। দেখতে পেলেন, মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন মালপত্র নিয়ে ট্রেনে উঠে গেলেন। স্টেশনে দুই পুলিশ খৈনি ডলতে ব্যস্ত, নজরই করল না।"

"জিয়াউদ্দিন কী বোকাই না বানালেন, সত্যি!"

দাদু চুপ করে শুনছিলেন | এবার বললেন, "শুভ, এতক্ষণ তোর দিম্মা তোকে নেতাজির কলকাতার কাহিনী শোনাল | মহানিষ্ক্রমণ | শুনতে শুনতে তুই এই গাড়িটাকে দেখতে পেলি, রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তুই তাতে সওয়ার হলি | তাই তো?"

"নিশ্চয়ই!"

"জানিস, আমি যখনই নেতাজির কথা মনে করে চোখ বুজি, আমি কিন্তু কলকাতা দেখি না |"

"কী দেখো তুমি দাদু?" শুভ উৎসুক |

"আমার মনের চোখে ভাসে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রুক্ষ, পাথুরে প্রান্তর | গরিব উপজাতিদের গ্রাম | অবিভক্ত ভারতের পশ্চিম সীমান্তের শহর পেশাওয়ার থেকে কাবুলের দিকে চলেছেন এক পাঠান ও এক দীর্ঘদেহী মানুষ, গাইডের সাহায্য নিয়ে, তীর্থযাত্রীর বেশে | খাজুরি ময়দানের মিলিটারি ক্যাম্প পেরিয়ে গেলেন | বর্ডার পার হয়ে শিনওয়ারি উপজাতিদের এলাকা, ছোট্ট একটা মসজিদ | তীর্থযাত্রীর দল একটু বসলেন | পাঠানের হঠাৎ কী মনে হ'ল, বললেন, 'আমরা কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের সীমা পেরিয়ে এসেছি | উপজাতিদের এলাকা স্বাধীন'|"

আনন্দে দীর্ঘদেহী মানুষটির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ক্লান্তি ভুলে গেলেন | স্বাধীন দেশ! তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্বাধীন দেশের মাটিতে! এ কী অনির্বচনীয় অনুভূতি! সুফি গানের উদাত্ত সুর আকাশে মিশছে | মানুষটি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন মুক্ত বাতাসে, 'আঃ, স্বাধীনতা, মুক্তি!' দ্বিগুণ শক্তি ফিরে এল যেন, নতুন উদ্যমে আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলা | কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো খচ্চর ভাড়া করে | পথে উপজাতিদের ছোট ছোট গ্রামে রাত কাটানো | গরিব মানুষগুলো আদর করে সাধ্যমতো খাবার বানিয়ে দেয়, রাতে যত্ন করে শোয়ার ব্যবস্থা করে | এই করে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে প্রায় দু'শ মাইল পথ অতিক্রম করে দলটি কাবুলে পৌঁছাল | পেশাওয়ার থেকে কাবুল | ইংরেজের অধিকারের অবিভক্ত ভারত থেকে স্বাধীন আফগানিস্তান |"

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলেছেন; দাদু থামলেন, তাঁর দৃষ্টি সুদূরে | শুভর মনে হ'ল দাদু যেন আর এলগিন রোডে নেই | টাইম মেশিনে চড়ে পৌঁছে গেছেন সুদূর কাবুলের রুক্ষ পাহাড়ের ঢালে, যেখানে এক দীর্ঘদেহী দেশপ্রেমিক তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক দূতাবাস থেকে আরেক দূতাবাসে | জার্মান, ইতালিয়ান, রাশিয়ান দূতাবাস | সাহায্য তাঁর চাইই | হাল ছাড়লে চলবে না |

শুভ আস্তে ঠেলা দেয়, "দাদু?"

দাদুর ঘোর কাটে, "চল শুভ, নেতাজি ভবনের ভেতরে যাই, মিউজিয়াম দেখে আসি | স্মৃতি ছড়ানো আছে সেখানে |"

দাদু আর দিম্মার হাত ধরে শুভ পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সেই ইতিহাসের সাক্ষী হতে |

ছবি: অন্তর্জাল

তথ্যসূত্র :

1. ডঃ অশোক নাথ বসুর বই 'My Uncle Netaji'
2. শিশির বসুর বই 'মহানিষ্ক্রমণ'
3. An interview with Nandita Bose, daughter-in-law of Sarat Chandra Bose, on Netaji's grand escape from house arrest in 1941
4. 'THE TALWARS OF PATHAN LAND AND SUBHAS CHANDRA'S GREAT ESCAPE' By TALWAR, BHAGAT RAM

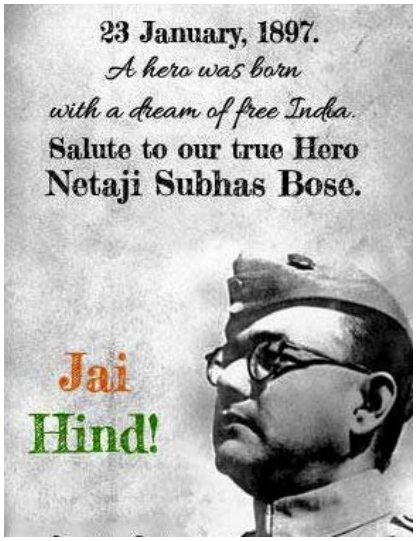

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

দেশের স্বাধীনতার লাগি করিলে জীবন দান,
হে বীর সুভাষ প্রণমি তোমায়, ধন্য তোমার প্রাণ!
তুমি ভারত-মাতার চোখের মণি, শ্রেষ্ঠ সুসন্তান!

ত্যজিলে নিজের সুখ-সংসার দেশের মুক্তি তরে,
ভীরু ইংরেজ না পারে যুঝিতে বাঁধে তোমা কারাগারে,
হাসিমুখে তুমি সয়েছ যাতনা, করেছ শাস্তি ম্লান।
হে বীর সুভাষ প্রণমি তোমায়, ধন্য তোমার প্রাণ!
তুমি ভারত-মাতার চোখের মণি, শ্রেষ্ঠ সুসন্তান!

মাথা তব নাহি করিতে নত, লয়েছ চরম পথ
আজাদ-হিন্দ ফৌজ করিলে গঠন, ছুটালে বিজয় রথ।

স্বার্থান্বেষী দেশেরই মানুষ মোহবশে করে ঘৃণা,
বিশ্বাসে তব হেনেছে আঘাত, করেছে – বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা,
হাসিমুখে তুমি সয়েছ সকলি, তবু – রেখেছ মায়ের মান।
হে বীর সুভাষ প্রণমি তোমায়, ধন্য তোমার প্রাণ!
তুমি ভারত-মাতার চোখের মণি, শ্রেষ্ঠ সুসন্তান!

আজকে দেশের রাজনীতিভরা অসৎ কর্মে চারিদিক,
বাহুবলে কাড়ে স্বাধীন বাক্য, নেতা লুটে খায় ততোধিক,
জন্ম লও হে এদেশে আবার, ফিরে এসো হে মহান।
হে বীর সুভাষ প্রণমি তোমায়, ধন্য তোমার প্রাণ!
তুমি ভারত-মাতার চোখের মণি, শ্রেষ্ঠ সুসন্তান!

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

ঈশ্বর যবে চন্দ্রেরে কহে – 'যাও ফের ধরাধামে',
জন্ম নিল সে ভগবতী ক্রোড়ে, বীরসিংহ গ্রামে।
নিপীড়িত পেল স্নেহের পরশ, অনাদৃত পেল আদর,
তিনিই মোদের দয়ার সাগর, আপন বিদ্যাসাগর।

শিশুকাল হতে বিদ্যাসাধনা, করি দারিদ্র জয়
বিদ্যাদাত্রী সঁপিলেন বর, নাশিলেন যত ভয়।
রচিলেন তিনি বাংলা ভাষায় বর্ণের পরিচয়,
পৃথ্বী জুড়ে বাংলা ভাষার করল সবাই সাদর।
তিনিই মোদের দয়ার সাগর, আপন বিদ্যাসাগর।

মায়ের কথা মান্য করায়, পেলেন জগৎখ্যাতি,
বিধবাদের বিধি, হলেন অন্ধকারের বাতি।

দুঃখীজনের আশার আলো, নিরাশ্রয়ের ঠাঁই,
বিপদকালে ধর্ম ভুলে, সবাই তারে পায়।
ঠাকুর তাঁরই দর্শনাশে তাঁরই গৃহে যায়,
সাহেবদেরও বুঝিয়েছিলেন, তাঁর পাদুকার কদর।
তিনিই মোদের দয়ার সাগর, আপন বিদ্যাসাগর।

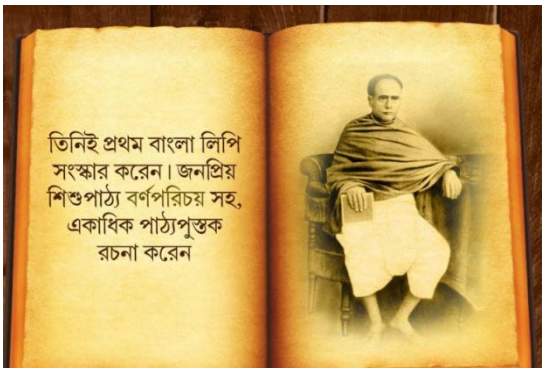

ভুল নামে ডাকি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

তুমি ছিলে বলে এগারোর মালতী একাদশী ছেড়েছে
তুমি ছিলে বলে ত্রয়োদশী কুসুম আবার
এঁকেছে স্বপ্ন, উদ্বেল মিলনের।
তুমি ছিলে বলে মেঘনাদবধ কবিতা হয়ে
ঝরেছে আমাদের বুকের মাঠে।

করুণার, দয়ার ঈশ্বর তুমি, অথচ
শুধুই প্রজ্ঞার নামে ডেকেছি তোমায়।
যশস্বী মননের সাথে মিশে থাকে সংবেদনা
কখনো জানিনি যে আগে, তাই ভুল নামে ডেকে
গেছি তোমায়, ডেকে যাই, হে ঈশ্বর, ক্ষমা করো!

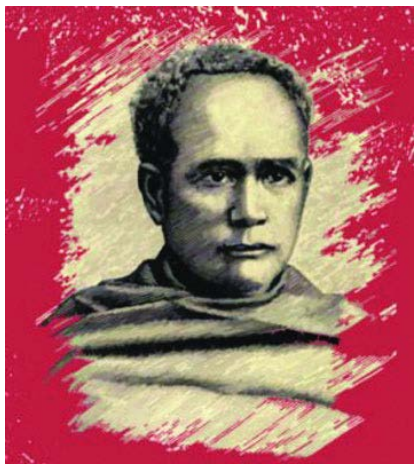

একটি স্বপ্নের নাম

উদ্দালক ভরদ্বাজ

তামিলনাড়ুর লক্ষ্মী
  পাঞ্জেরির হাবিব
    বাদিয়ানার মোহন
এক মুহূর্তে চিনে নেয় সেই নাম।
আর, অসমর্থ, অরাজক, অনৈতিক
ব্যভিচারে ভরা দেশের দিকে তাকিয়ে
চোখের জলে ভেসে ভাবে –
কী হতে পারত, কী হ'ল না, অথচ হয়েছিল...
      আসমুদ্র হিমাচল
  হিন্দু শিখ পারসিক
মুসলমান খ্রীষ্টানী
  এক তারে বেঁধে
      রাষ্ট্র সেনানী...
    সবটাই ম্যাজিক তো!
যা হতে পারত
  যা হ'ল না এবং
    যা হয়েছিল।

মইরাঙের জঙ্গলের পথে
মৃত সৈনিকের শরীরের ওপর গজিয়ে ওঠা
শতাব্দী পুরনো ঘাস আজও দখিনা হাওয়ায়
দুলে উঠে বলে যায় তোমারই নাম
সুভাষকে ভালবাসে সে যে...

জার্মান প্রেয়ারির সুদূর নগরীর
নির্জন কুঠির পাশের মাঠ, যখন গভীর রাতে
একলা শুতে যায়, মাটির বুক পেতে –
শোনে সেই তাপার্ত নাম, এমিলি
সুভাষকে ভালবাসে সে যে...

সমস্ত পৃথিবীতে থেকে গেছ তুমি
ঈশ্বরের মতো, তাই আজও প্রত্যেক প্রভাতে
তোমারই স্বর্ণের ঋণে নত হয় আহত ভারত।
কেঁদে যায় কান্নায়, ভেসে যায় ভালবাসায়,
মরে যায় লজ্জায়, আর ডেকে যায় মনে মনে
নেতাজি, নেতাজি, নেতাজি...

গল্পগুলো পালটাচ্ছে না সুভাষবাবু
এখনও স্বৈরাচারীর লেখা ইতিহাসে
বিদ্রোহী হয়ে যায় আতঙ্কবাদী
নপুংসক কাপুরুষের দল তোমাকেও
দিয়েছিল তকমা, দিতে চেয়েছিল...
অথচ সমস্ত কালি, অশোভন কলঙ্কের
দাগ মুছে, তুমি আজও অমলিন।
ভারতবর্ষের প্রত্যেক ধূলিকণায়,
প্রত্যেক ভরতপুত্রের শিরায় শিরায়
বয়ে যাওয়া রক্তের স্রোতে,
আজও শুধু এই নাম।

কী হতে পারত,
কী হল না, অথচ
কী এক অদ্ভুত স্বপ্ন
গড়েছিলে, গড়ে যাও, তুমি...
যতদিন সেই স্বপ্ন স্বর্ণ-মুক্তির,
যতদিন সেই স্বপ্ন প্রাণের ভাস্বর প্রমার
ততদিন তোমার কাজ
তোমার ফৌজের বেঁধে ওঠা
তোমার প্রজ্ঞার হাত
ধরে চলা...

ফরমোজার বিমান বন্দর, কিম্বা সাইবেরিয়ার ঠাণ্ডা গারদ,
অথবা ফয়জাবাদের গুমনামী আঁধার
কোন অন্ধকার তোমাকে ঢাকতে পারেনি
কোন অন্ধকার তোমাকে মারতে পারেনি।
এদেশের প্রত্যেক ধূলিকণায়
প্রত্যেক রক্তের ফোঁটায় তোমারিই নাম...

সুভাষ মরেনি তাই,
মরবে না কোনদিন
মরতে পারে না।
সুভাষ একটি সত্তার নাম!
একটি শাশ্বত সত্য
একটি অহংকার
যতদিন জীবনের ঘ্রাণ
যতদিন নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে
দেশের মাটির কাছে নত হওয়ার অঙ্গীকার,
যতদিন নিখিলের মুক্তির হাহাকার
তুমি থাকবে, তুমি আছ
তুমি রয়ে যাবে...

তোমার স্বপ্নের চোখে চোখ রেখে
তোমার ভরসায় বুক বেঁধে,
স্বাধীনতার পৌনে শতাব্দী পরেও পরাধীন ভারত
নীতিহীন অরাজকতায় মুখ-থুবড়ে-পড়া ভারত
আপামর জনতার থেকে মুখ-ফেরান ভারত
বেঁধে নেবে তোমারই ফৌজ আবার
আসমুদ্র হিমাচল এক সাথে
এক ডাকে গর্জে উঠবে
"জয় হিন্দ", আবার!

নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী

লেখক ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর

বেবী কারফরমা

বর্ধমানের দেওয়ানি আদালতে চকদিঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহরায়ের হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন – "আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা বিদ্যাসাগর | আমি প্রয়াত ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র | নিবাস কলকাতা, বয়স ৫৬ বৎসর | পেশায় লেখক ব্যবসায়ী |... আমি কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলাম | আমি অনেকগুলি বাংলা ও সংস্কৃত বই লিখেছি |" তাঁর নিজের দেওয়া পরিচয়ের সূত্র ধরেই আলোচনায় আসি...

১৮৪৭ সালে তিনি এবং তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার যৌথ উদ্যোগে সংস্কৃত প্রেস এবং একটি বইয়ের ডিপজিটারী (শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে 'বইয়ের আড়ত') স্থাপন করেন | তিনি নিজেই একজন লেখক ছিলেন তাই শুরু থেকেই পাঠ্যপুস্তকের সমস্যাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন | সেই সময়কার পুস্তকগুলোর বাঁধাই এবং ছাপার মান যেমন খুব খারাপ ছিল তেমনি পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তুও বেশ কঠিন এবং ভুলেভরা ছিল | তাই ছাত্রদের কথা ভেবে তিনি 'বাসুদেব চরিত' রচনা করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় সেই বই আর প্রকাশ করতে পারেননি | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি.টি মার্শালের অনুরোধে তিনি হিন্দি 'বেতাল পচ্চিসী'র বাংলা অনুবাদ (বেতাল পঞ্চবিংশতি) করেন | অধিক দক্ষিণা নিয়ে পি. এস. ডি. রোজারিও কম্পানিই পুস্তকটি ছাপিয়েছিল কিন্তু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পুস্তকটি পড়ানোর অনুমতি মিলল না | অগত্যা বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের কাছ থেকে শংসাপত্র জোগাড় করে পুস্তকটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন | এরপর তিনি জে. মার্শম্যানের 'History of Bengal' বাংলায় অনুবাদ করেন কিন্তু 'বাংলার ইতিহাস' বইটির কোথাও বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ ছিল না, কেবলমাত্র "মার্শালসাহেবের অনুমত্যানুসারে লিখিত" কথাটা লেখা ছিল | এই পুস্তকটিও পি. এস. ডি. রোজারিও কম্পানিই ছাপিয়েছিল | রোজারিও কম্পানির ছাপার খরচ অনেক বেশি অথচ ছাপার মান খুব খারাপ ছিল |

সে সময় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে 'স্কুল অফ সোসাইটি'র একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল | ১৮২০ সাল থেকে ১৮২৫ সাল অবধি সোসাইটির বই বিক্রি হয়েছিল লক্ষাধিক | তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত 'নীতিকথা', 'ভূগোল বৃত্তান্ত', 'গ্রীসের ইতিহাস', বাংলায় প্রকাশিত 'পাটিগণিত'-এর প্রবল চাহিদা সত্ত্বেও 'স্কুল বুক অফ সোসাইটি' কিন্তু খুব একটা লাভবান হতে পারেনি | কারণ প্রথমতঃ বইগুলো ছাপা হতো ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে আর ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপার খরচ ছিল অনেক বেশি | জেমস লং সাহেবও একথা উল্লেখ করেছিলেন (high charges of the Baptist Mission Press)| দ্বিতীয়তঃ 'স্কুল বুক অফ সোসাইটি'র পরিচালন কমিটি ছিল অনেক বড়, তাই সংস্থাটির নিজস্ব একটা খরচও ছিল | তৃতীয়তঃ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত আধা সরকারী এই সংস্থাটি শুধুমাত্র কলকাতায় নয়, মফস্বলেও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করত | মফস্বলে 'স্কুল বুক অফ সোসাইটি'র নিজস্ব কোন শাখা না থাকার জন্য সেখানকার পুস্তক বিক্রেতার উপর নির্ভর করতে হতো, আর পুস্তক বিক্রেতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো বই চড়া দামে বাজারে বিক্রি করত | বস্তুতঃ টাকা পয়সার অভাবেই 'সোসাইটি' পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন কিংবা নতুন বই মুদ্রণের ব্যাপারে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করতে পারেনি | সরকার বাংলা বই ছাপার জন্য সোসাইটিকে ১৮০০ টাকা আর ইংরেজি বই ছাপার জন্য ৬২৭০ টাকা অনুদান দিত | ফলস্বরূপ নতুন নতুন বাংলা পুস্তক ছাপার বদলে পুরনো ভুলেভরা পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণের ফলে পাঠ্যপুস্তকের মান বাড়েনি আর নতুন পাঠ্যপুস্তক রচয়িতার কেউ খোঁজও করেনি |

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশনা ব্যবসায় এসেছিলেন কিছুটা বাধ্য হয়েই কারণ সেই সময় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তার জোগান ছিল না | তবে তাঁর বংশে বিদ্যাসাগরই যে প্রথম ব্যবসা করেছিলেন তা কিন্তু নয়, তাঁর পিতা ঠাকুরদাসও কাঁসা-পিতল, রেশমের ব্যবসা করেছিলেন |
মাতা ভগবতী দেবীর মাসতুতো ভাই, শ্যামাচরণও কলকাতায় লোহার সিন্দুক, চাটু, তাওয়া তৈরি ও বিক্রি করতেন |
ব্রাহ্মণদের ব্যবসার ক্ষেত্রে কুলগত বাধা থাকলেও সংস্কৃত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিন্তু চাল ও কাঠের ব্যবসা করে

বেশ ধনবান হয়েছিলেন | পরবর্তীকালে তিনি বিদ্যাসাগরের সাহচর্যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন | বিদ্যাসাগর প্রকাশনা ব্যবসায় আসার অনেক আগেই জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়েও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস' নামে একটি প্রেস স্থাপন করেছিলেন (১৮১৮) এবং তিনিও লেখক ছিলেন | শুধু তাই নয় কলকাতায় একদা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যবসায় প্রথম সারিতে ছিলেন | তাঁদের বেশিরভাগেরই পদবী ছিল ব্যানার্জী, মুখার্জী, ঠাকুর, মিত্র, শর্মা, সেন, ঘোষ, দত্ত, মিত্র, বসু | ১৭৬৬ সালে একজন ব্যবসায়ীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল | তখন ৯৫ জন প্রথম সারির ব্যবসায়ী তার মৃত্যুদণ্ড খারিজের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন |

যাইহোক, ফিরে আসা যাক বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে...

১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে তিনি এবং তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার যৌথভাবে একটা প্রেস কেনেন | প্রেসের ঋণ বাবদ ৬০০ টাকা জোগাড় করার জন্য তিনি একাই মার্শাল সাহেবের শরণাপন্ন হন | মার্শাল সাহেবের অনুরোধে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে 'অন্নদামঙ্গল' পুঁথি এনে বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করে ১০০ কপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য মুদ্রণ করেন ছয়'শ টাকার বিনিময়ে | পুনর্মুদ্রিত 'অন্নদামঙ্গল' সম্পাদনা করেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার | বিদ্যাসাগরকে লেখক-ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছিলেন মার্শাল সাহেব | তবে এও ঠিক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরের বই কেনা হয়েছে তা কিন্তু নয়; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) এবং আরও অন্যান্য লেখকদেরও একশোর বেশি বই কলেজ কর্তৃপক্ষ কিনেছিলেন | বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস আর 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী' স্থাপন করেছিলেন পটলডাঙ্গায় | আর এই পটলডাঙ্গা ছিল কলেজ স্ট্রীটের নিকটেই | তিনিই প্রথম বিদ্যালয়গুলোর কাছে বই বিক্রির ব্যবস্থা করেন, কারণ সেই সময় কলেজ স্ট্রীটে বই পাওয়া যেত না | চীনা বাজার ছিল বই বাজারের প্রধান কেন্দ্রস্থল আর উত্তর কলকাতার বটতলায় অনেক প্রেস ও প্রকাশনা হাউজ ছিল | চীনা বাজারে কিছু বইয়ের দোকান থাকলেও বটতলায় কিন্তু বই বিক্রির কোন দোকান ছিল না | বটতলার বই ব্যবসায়ীরা ফেরিওলার মারফৎ কাছেপিঠে কিংবা দূরদূরান্তরে বই বিক্রি করতেন | বিদ্যাসাগর তাঁর ডিপজিটারীতে শুধুমাত্র সংস্কৃত প্রেসের ছাপা তাঁর বই মজুত রাখতেন না, অন্যান্য লেখকদের ও প্রকাশকদের বইও মজুত রাখতেন | পরিবর্তে লেখক ও প্রকাশকরা তাঁকে ভাড়া দিতেন | শুরুতে সংস্কৃত প্রেসের ঠিকানা ছিল ৬২ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট আর ডিপজিটারীর ছিল ৩০ নম্বর বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট | পরবর্তীকালে সংস্কৃত প্রেস ২৫ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীট আর ডিপজিটারী ১৪৮ নম্বর বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে উঠে যায় |

তাঁর নিজের প্রকাশনার দিকে তিনি সর্বদাই দৃষ্টি রাখতেন | আগে অক্ষর যোজনার ক্ষেত্রে কম্পোজিটারকে যেমন পরিশ্রমও করতে হতো তেমনই তার সময়ও প্রচুর লাগত | বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম নিজে বহু পরিশ্রম করে অক্ষর যোজনার পুরনো পদ্ধতির বদল করেন | তাঁর সাজানো অক্ষরগুলো সংরক্ষণ করা হয়, যা 'বিদ্যাসাগর সার্ট' নামে পরিচিত | নতুন এই অক্ষর যোজনায় কম্পোজিটারের ক্ষেত্রে লাভজনক হয়েছিল, কারণ এতে শ্রম ও সময় দুটোই বেঁচেছিল | আগে এমনও হয়েছে যে একই বই বিভিন্ন হরফে ছাপা হয়েছে | তিনিই প্রথম বাংলা পাঠ্যবইয়ের মান উন্নত করতে শ্রীরামপুরের একটা ফাউন্ড্রি থেকে নতুন হরফ তৈরি করিয়েছিলেন (১৮৬৬)| হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে "তিনি সবগুলি বইয়ের প্রুফ নিজে দেখতেন এবং সর্বদাই উহার পরিবর্তন করিতেন | দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্তনেই মানে খুলিয়াছে |" ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় | বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ১৫২ বার এবং দ্বিতীয়ভাগ ১৪০ বার সংস্করণ হয়েছিল | প্রথমে বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগের দাম ছিল তিন পয়সা, পরে তা কমিয়ে করা হয় দুই পয়সা | আর প্রথমে বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের দাম ছিল তিন পয়সা, পরে তা বাড়িয়ে করা হয় পাঁচ পয়সা | বোধোদয় ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৯০ সাল অবধি ১০৬ বার সংস্করণ হয় | ১৮৫৬ সালের পর থেকে বহুদিন পর্যন্ত এর দাম ছিল দু'আনা | ১৮৫২ সালে 'নীতিবোধ'-এর দাম ছিল আট আনা, কিন্তু পরে ১৮৫৬ সালে দাম হয় পাঁচ আনা | 'বাংলার ইতিহাস'-এর প্রথমে দাম ছিল এক টাকা, পরে দাম কমে ছয় আনা | 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-র দাম ছিল তিন টাকা | 'অন্নদামঙ্গল'-এর দাম ছিল ছ'টাকা | এছাড়াও বিদ্যালয়-

গুলিতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অপরিহার্য ছিল 'ঋজুপাঠ', 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'চরিতাবলী', 'কথামালা' ইত্যাদি, যা অন্যান্য প্রকাশকদের থেকে দামে অনেকটা কম ছিল | অন্যান্য প্রকাশকদের দামের তুলনা করলে দেখা যায় চার্লস উইলকিন্সের 'ভগবৎ গীতা'-র ইংরেজি অনুবাদের দাম ছিল এক গোল্ড মোহর | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত 'হিতোপদেশ'-এর দাম ছিল আট টাকা, 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর দাম ছিল ছ'টাকা, 'লিপিমালা'-র দাম ছ'টাকা, 'প্রতাপাদিত্য চরিত'-এর দাম ছিল পাঁচ টাকা|

এর পরেও কিন্তু সরকারী শিক্ষা বিভাগে দক্ষিণবঙ্গের স্কুল ইন্সপেক্টর হজসন প্র্যাট ১৮৫৫-১৮৫৬ সালে বার্ষিক রিপোর্টে জানান সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রকাশিত বইয়ের মান ভাল হলেও দাম খুব বেশি | এবং তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ করেন সংস্কৃত প্রেস থেকে কপিরাইট কিনে সরকারীভাবে প্রকাশ করতে | এ ব্যাপারে গর্ডন ইয়ংয়ের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি | শিক্ষা বিভাগ থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে চিঠি গেল | তাতে লেখা ছিল যদি সংস্কৃত প্রেস বইয়ের দাম না কমায় তাহলে সরকার বিকল্প ব্যবস্থা নেবে | এবং শিক্ষা বিভাগ বিদ্যাসাগরকে শীঘ্রই তাঁর মতামত জানাতে বলল | সরকার যদি সংস্কৃত প্রেসের জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকগুলোর কপিরাইট কিনেই নেয় তাহলে ছাপাবে কোথায়? ১৮৩৫ সালের পর থেকে স্কুল বুক সোসাইটি নতুন বই ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছে | তাছাড়া সোসাইটি বই ছাপায় ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে; সেখানে ছাপার খরচও প্রচুর | এছাড়াও সে সময় বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ কোন লেখক বা প্রকাশক ছিলেন না, যিনি বা যাঁরা এত কম খরচে উপযুক্ত পাঠ্যবই সরকারকে দিতে পারবে | বিদ্যাসাগর ধীরেসুস্থে চিঠির উত্তর দিলেন, তা প্রায় মাস খানেক পরে | তিনি বেশ কড়া ভাষায় লিখলেন, "the tenor of which appears to me to be so very objectionable." তিনি এও জানিয়ে দিলেন তাঁর বইয়ের দাম মোটেও বেশি নয়, সরকার ইচ্ছা করলে অন্যত্র বই নিতেই পারে | কারণ তিনি ভালভাবেই জানতেন অন্যত্র বই নিলেও স্কুল বুক সোসাইটি সংস্কৃত প্রেসের থেকে কম দামে বিক্রি করতে পারবে না, অন্যান্য প্রেসের খরচ অনেক বেশি | আসলে উপনিবেশিক সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত প্রেসের গ্রন্থস্বত্ব কিনে নিজেদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো|

(প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য সে সময় লেখকরা ঠিকমতো কপিরাইট না রাখার ফলে প্রকাশকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য পেতেন না | ফলতঃ একই বইয়ের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দাম হতো | যেমন শ্রীরামপুর প্রেসের কৃত্তিবাসের 'সম্পূর্ণ কাব্য'-র দাম চব্বিশ টাকা অথচ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত বইটির দাম দেড় টাকা | আবার কৃত্তিবাসের 'আদিপর্ব'-র দাম সুধাসিন্ধু প্রেসে দুই আনা আর রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রেসের দাম তিন টাকা |)

সে সময় বিদ্যাসাগর বীরসিংহে তিন'শ জন ছাত্রছাত্রীর ভরণপোষণ সমেত তাদের পড়াশোনার সমস্ত খরচ এবং আরও অনেকের পড়াশোনার খরচ একাই বহন করতেন| বিভিন্ন মডেল স্কুলের ছাত্রদের কথা চিন্তা করে তিনি দাম কমাতে রাজি হলেন তবে শর্তসাপেক্ষে | বটতলার বই ব্যবসায়িকদের মতো তিনিও বই ছাপানোর অগ্রিম মূল্য পেলে শতকরা পঁচিশ ভাগ দাম কমাতে পারবেন | তিনি সংস্কৃত প্রেসের পনেরোটা বই সরকারের কাছে পাঠালেন অনুমোদনের জন্য | কিন্তু সরকার মাত্র আটটি বই অনুমোদন করলেন এবং দু'বছরের ছাপার অগ্রিম মূল্য দিয়ে দিলেন (১৮৫৭ সাল)| বিদ্যাসাগর সেই আটটা বইতেই পঁচিশ শতাংশ দাম কমিয়ে দিলেন | দু'বছর পর সরকার আর বই ছাপানোর জন্য অগ্রিম মূল্য বিদ্যাসাগরকে দিলেন না | তবুও কিন্তু তিনি সরকারের নির্দেশে তাঁর বাংলা পাঠ্যবই পূর্ববাংলা, আসামে পাঠিয়েছিলেন (১৮৫৯ সাল)| সরকার কেবলমাত্র ভেন্ডারের খরচ বাবদ তাঁকে শতকরা পনের টাকা কমিশন দিয়েছিলেন|

বিদ্যাসাগর যেমন সরকারী বিভাগের প্রভাবশালী কর্মচারী ছিলেন, তেমনই তিনি নিজের যোগ্যতায় বেসরকারী ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন | তাঁর এই প্রতিষ্ঠায় অনেকেই ঈর্ষা করতেন, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বকে কেউ খর্ব করতে পারেননি|

তাঁর নামের সাথে ব্যবসায়ী কথাটা বড়ই বেমানান | তিনি মোটেই ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন না, বা কখনও চাতুরীর সাহায্যে ব্যবসার প্রসার ঘটাবার চেষ্টা করেননি | তবে লেখকের গ্রন্থস্বত্ব কিনে নেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, কারণ এতে গ্রন্থকার নতুন নতুন সৃষ্টিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে|

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে একবার আয়কর অধিকর্তা এইচ. এল. হ্যারিসন ভগবতীদেবীর আহ্বানে তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকেই ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখেছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের হিসাব বহির্ভূত কোন সম্পত্তিই ছিল না। আয়কর অধিকর্তার আগমনের পিছনে অন্য একটা কারণ ছিল, যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। তবুও প্রথম থেকে শুরু করলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে।

সে সময় বীরসিংহ হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। বীরসিংহের কাছে খড়ার ছিল কাঁসা-পিতলের জন্য বিখ্যাত, চন্দ্রকোনা, রামজীবনপুর রেশম ও সূতিবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। জাহানাবাদ ছিল সূতি রেশম কাঁসার জন্য বিখ্যাত। রাধানগর ছিল রেশমের বাজার। সিপাহী বিদ্রোহের পর কম্পানির আয়ের উৎসে টান পড়লে ভাইসরয়ের নির্দেশে জেমস উইলসন (অর্থনীতিবিদ) ভারতে আসেন। তিনি অর্থনৈতিক যে সংস্কার করেন তার ফল কম্পানির পক্ষে ভালই হয়েছিল। কৃষি থেকে সরকার প্রায় আয়করের পঞ্চাশভাগ সংগ্রহ করত। অন্যান্য জায়গার মতো জাহানাবাদেও বড় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ছোট ছোট ব্যবসায়ীরাও আয়করের আওতা থেকে বাদ পড়ত না। পাঁচ'শ টাকার বেশি রোজগার হলে তাদেরও কর দিতে হতো। কর সংগ্রহ করতেন জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রমেশ মুখোপাধ্যায় নামক এক ধূর্ত ব্যক্তি (সেসময় আয়কর বিভাগের আলাদা কোন কর্মচারী ছিল না)। তিনি ব্যবসায়ীদের খুবই উৎপীড়ন করতেন। বেশিরভাগ সময়ই দুজন ব্যবসায়ীর আয় একসঙ্গে ধরে বার্ষিক পাঁচ'শ টাকা দেখিয়ে দিতেন। কখনও নিজের ইচ্ছেমতো অনুমান ভিত্তিক একটা আয় ধরে তার উপর কর বসাতেন। বিদ্যাসাগরের দেশের ব্যবসায়ীরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য পড়শি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হয়। বিদ্যাসাগর নিজেও আয়কর দিতেন এবং সংস্কৃত প্রেস থেকে আয়কর সংক্রান্ত বইও ছাপা হতো, তাই তিনি আয়কর আইনটা ভালই বুঝতেন। তিনি রমেশবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন; তিনি তাঁকে চিঠি দেন এবং সাক্ষাৎও করেন। কিন্তু রমেশবাবু তাঁর কথা শুনলেন না। তখন বিদ্যাসাগর গভর্নরকে চিঠি দিলেন এবং গভর্নরের সাথে দেখা করলেন। গভর্নর বর্ধমানের কালেক্টর এইচ. এল. হ্যারিসনকে তদন্তকারী অফিসার হিসাবে জাহানাবাদে যাবার নির্দেশ দেন। হ্যারিসন সাহেব দু'মাস যাবৎ ঘাটাল, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোনায় তদন্ত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে তদন্ত করতে সাহায্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কথামতো তাঁর মা ভগবতীদেবী বাংলায় চিঠি লিখে তাঁকে বীরসিংহের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। হ্যারিসন সাহেব সেই আমন্ত্রণই রক্ষা করেছিলেন।

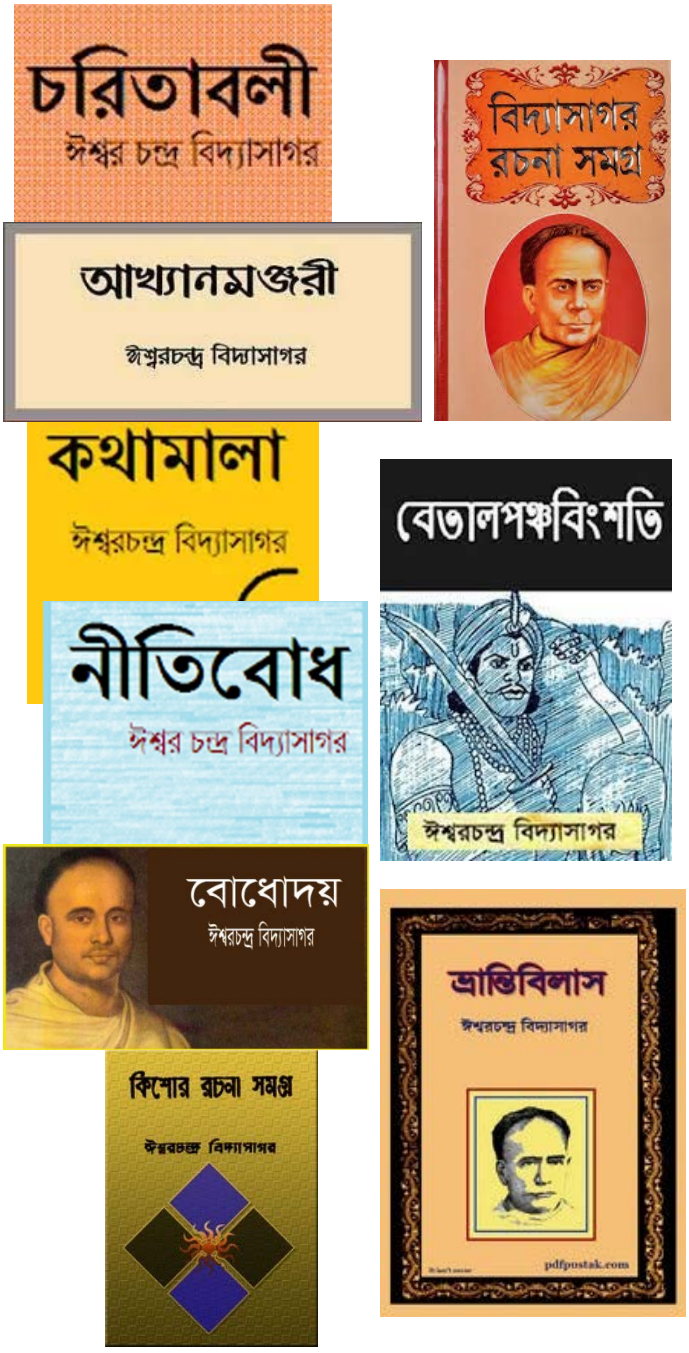

বিদ্যাসাগর মুসলমান পল্লী ও ফকিরের গান

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

ব্রাহ্মণ পন্ডিত মানুষ | নীচু জাত ও অন্য জাত সম্পর্কে ছুঁই ছুঁই ভাব থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বিদ্যাসাগরের মধ্যে একেবারেই তা ছিল না | তাঁর কাছে রাজা উজিরও যা, গরিব দুস্থ ও নীচু জাতের মানুষও তাই | তার হাজারো নজির জীবনীগ্রন্থে লেখা আছে |

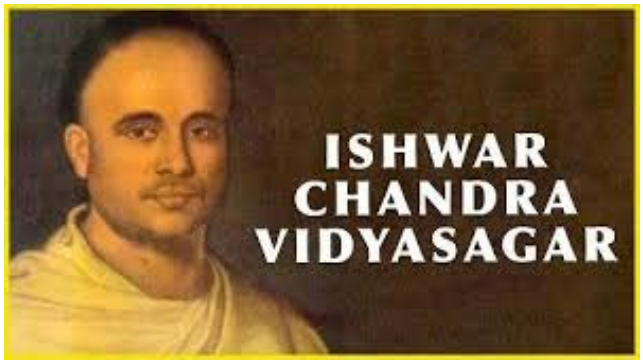

বর্ধমান ফিভার –

স্বাস্থ্যের কারণে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝেই বর্ধমানে গিয়ে থাকতেন | বেশ মনোরম ও স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসাবে এটি তাঁর পছন্দের জায়গা ছিল | কিন্তু ১৮৬৮-৬৯ সালে জাঁকিয়ে এল 'বর্ধমান ফিভার'| অনির্ণীত এক রোগের প্রকোপ | পরে জানা গেছে সেটা ছিল ম্যালেরিয়া | এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বর্ধমান জর্জরিত | যা ছিল স্বাস্থ্যকর জায়গা তা হয়ে উঠল মহামারী কবলিত | আগে থেকে বিদ্যাসাগরের সেখানে যাতায়াত ছিল | গিয়ে প্রথমত উঠতেন বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে | বান্ধব আপ্যায়নের কারণে বলা হতো 'প্যারীবাবুর হোটেল'| বর্ধমানের এই দুর্দিনে বিদ্যাসাগর ঝাঁপিয়ে পড়লেন | মহামারীর মোকাবিলা করতে হবে | তিনি কলকাতায় এসে গ্রে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন | সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও শৈথিল্য যতটা কমানো যায়, রোগ চিকিৎসায় সরকারী ব্যবস্থাকে যতটা সক্রিয় করা যায় সে চেষ্টায় কোনও কসুর করলেন না | কিন্তু এটুকু করেই ক্ষান্ত হলেন না | তিনি নিজে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করলেন | ডাক্তার নিয়োগ করলেন এবং অসুস্থ রোগীরা যাতে ওষুধপত্র, বস্ত্র পায় তার ব্যবস্থা করলেন | এসব তথ্য মিলেছে তাঁর জীবনীকারদের বিবরণ থেকে | বিদ্যাসাগর কোথায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চিকিৎসালয় স্থাপন করে দুস্থ, মরণাপন্ন রোগীদের বাঁচানোর লড়াই করেছিলেন তা নিয়ে দুরকম তথ্য মিলেছে | এক, কমলসায়রের কাছে, দুই, পার্কাস রোডে | কমলসায়র বর্ধমান শহরের বাইরে জি টি রোড পার্শ্বস্থ বর্ধমান রাজার গোলাপ-বাগের কাছাকাছি | আর পার্কাস রোড বর্ধমান শহরের অভ্যন্তরে জি টি রোড ও তেঁতুলতলা বাজারের সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তা | দুটি জায়গার মধ্যে একটাই মিল, দুটি জায়গাই মুসলিম অধ্যুষিত |

কমলসায়র বিষয়ে জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন যে তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্যে আসি | বিদ্যাসাগর অনুজ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন –

"কমলসায়রের চতুর্দিকেই দরিদ্র, নিরুপায় মুসলমানের বাস | এই পল্লীর বালক, বালিকাগণকে (বিদ্যাসাগর) প্রতিদিন প্রাতে জলখাবার দিতেন | যাহাদের অন্নকষ্ট ও পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ ও ছিন্ন দেখিতেন, তাহাদিগকে অর্থ ও বস্ত্র দিয়া কষ্ট নিবারণ করিতেন | এতদ্ভিন্ন কয়েক ব্যক্তিকে দোকান করিবার জন্য মূলধন দিয়াছিলেন | কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি বালক বালিকা সকলেই তাঁহাকে আপনার ঘরের লোকের মতো মনে করিত ও আন্তরিক ভালবাসিত এবং পিতা ও বন্ধুর ন্যায় ভক্তি ও মান্য করিত | ওই সময় অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) কমলসায়রের সন্নিহিত একটি মুসলমান কন্যার বিবাহের সমস্ত খরচ প্রদান করিয়াছিলেন |"

ইন্দ্রমিত্র এই বিবরণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন – "বিদ্যাসাগর কিছুদিন বর্ধমানাধিরাজ বাহাদুরের কমলসায়রের পাশের বাগানবাড়িতে থেকেছেন |"

বর্ধমানরাজ বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন | তাঁর সমাজ সংস্কার-মূলক আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে প্রভূত সমর্থন দিয়েছিলেন সে তথ্য মেলে | সুতরাং স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে বিদ্যাসাগর বর্ধমানে এলে তাঁকে আতিথ্য দান করবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই | কমলসায়রের পাশে বিখ্যাত বাগানবাড়ি বলতে তো গোলাপবাগ বোঝায়, যেখানে এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিষ্ঠান | বিদ্যাসাগর কি সেখানে থাকতেন? স্পষ্ট নয় | তবে রাজার অতিথি হয়েই থাকুন আর

গোলাপবাগেই থাকুন – ওই যে কথায় আছে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'! বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে রাজ-অতিথি হয়েও তাঁর চিত্তপ্রবৃত্তি অনুসারে মানবসেবার কাজ করে গেছেন। ঘটনাক্রমে বা নৈকট্যবৈগুণ্যে তাঁর সেই সহৃদয় ও অকাতর সাহায্যের সুযোগ পেয়েছে দরিদ্র মুসলমান পল্লীর মানুষজন। শম্ভুচন্দ্রের বিবরণে তা স্পষ্ট। খবর নিয়ে জানা গেছে কমলসায়র এখনও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। তবে এই বিবরণে বর্ধমান ফিভার বা মহামারীর উল্লেখ নেই।

বর্ধমানে গেলে তিনি সাধারণত প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে উঠতেন – সে তথ্য মিলেছে। কিন্তু বর্ধমান ফিভারের সময় তিনি যে চিকিৎসা শিবির করেছিলেন এবং চিকিৎসক নিয়োগ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটি ঠিক কোন জায়গায় তা অনুসন্ধানের বিষয়। সম্প্রতি জানা গেছে তিনি ডেরা গেড়েছিলেন পার্কাস রোডে। বর্ধমানের এক মুক্তমনা শিক্ষাবিদ গোলাম আসগর জায়েদীর বাড়িতেও স্থাপন করেছিলেন তাঁর স্বাস্থ্যশিবির। গোলাম আসগর জায়েদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় কলকাতা মাদ্রাসার যুক্তিবাদী শিক্ষক আব্দুর রহিমের ছাত্র নদীয়ার মামজোয়ান গ্রামের শ্যামাচরণ সরকারের সৌজন্যে। শ্যামাচরণ সরকার ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় বাংলার শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষক হন (১৮৪২, ১ অক্টোবর)। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়ানোর চাকরি নিয়েছেন। পাঠানুরাগে তাঁরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

এই শ্যামাচরণের মাধ্যমে কলকাতার মাদ্রাসা লাইব্রেরি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের যোগসূত্রে হুগলীর মৌলানা গোলাম কাদের, মানিকগঞ্জের আদালুত খান ও বর্ধমানের গোলাম আসগর জায়েদী প্রমুখ মুক্তমনা শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর পরিচিত হন ও তাঁদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গোলাম আসগর জায়েদীর পারিবারিক সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর বর্ধমান ফিভারের মোকাবিলায় নেমেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। গোলাম আসগর জায়েদীর পৌত্র ও নির্মল কুমার বসুর বন্ধু আবুল হায়াত বর্ধমান বাণীতে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তাঁর আব্বা আব্দুল মজিদ ও প্রতিবেশী ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র (গোপাল) ওই চিকিৎসা শিবিরের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকাররা গঙ্গানারায়ণ মিত্রর (যিনি কিনা প্যারীচাঁদ মিত্রের আত্মীয়) কথা লিখেছেন, কিন্তু আব্দুল মজিদের কথা কেউ লেখেননি। গোলাম আসগর জায়েদীর কথাও অনুচ্চারিত। অনুচ্চারিত থাকলেও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অন্য সূত্র-প্রমাণ মিলেছে। সাক্ষাৎকার-দানকারী আবুল হায়াতের বড় চাচা (গোলাম আসগর জায়েদীর এক পুত্র), আব্দুল জব্বার সে সময়ে ছিলেন সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাছে সাঁওতালদের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচারের কথা সবিস্তারে জেনে বিদ্যাসাগর সাঁওতাল পরগণায় তাঁর বিশ্রামাবাসের জন্য উপযুক্ত বাড়ি খুঁজতে

বলেন। প্রথমে তিনি দেওঘরে একটি বাড়ি দেখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের তা পছন্দ না হওয়ায় কার্মাটারের বাড়ির সন্ধান দেন আবদুল জব্বার। এক সাহেবের বিধবা ছিলেন সেই বাড়ির মালিক। তাঁর কাছ থেকে বাড়িটি কিনে 'নন্দনকানন' নাম দিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর শেষ জীবনের অবসর-আবাস বানান। অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে Character Book of the Subordinate Executive Service (Part-II)-এর রেকর্ড বইতে ৫২ নম্বরে Abdool Jubber-এর (Period 1859-1894) নাম নথিবদ্ধ আছে। ইনি ছিলেন বিদ্যাসাগর সুহৃদ বর্ধমানের গোলাম আসগর জায়েদী পরিবারের সন্তান। এই তথ্যগুলি তাঁর লিখিত জীবনীগ্রন্থে নেই, তাই একটু বিশদে লিখতে হ'ল।

এবার আসি বর্ধমান মহামারীকালে বিদ্যাসাগর কী করেছিলেন, কাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন সেই তথ্যে। জীবনীগ্রন্থে সেসব তথ্য আছে। যা জানা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সহায়ক চিকিৎসকদের নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন; প্রধানত মুসলমান-অধ্যুষিত পল্লীতে।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন –

"১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাশয় প্যারীচরণ মিত্রের (প্যারীচাঁদ মিত্র) বাটীর সন্নিহিত রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন | সেই সময় বর্ধমানে দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয় | অগ্রজের বাসার অতি সন্নিকটে একটি মুসলমান পল্লী ছিল | বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না | নিজ বাসা বাটীতে তিনি একটি ডিসপেনসারি খুলিলেন এবং ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের হস্তে তাহার ভার ন্যস্ত করিলেন |... তাঁহার ডিসপেনসারির ব্যয় দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল | ঔষধ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে সাগু, অ্যারারুট বিতরিত হইতে লাগিল | দুর্বল রোগীর জন্য দুগ্ধ, সুরুয়ার পয়সা দিবার ভার গঙ্গানারায়ণ-বাবুর উপর অর্পিত হয় | তিনি রোগীদের বাটীতে যাইয়া দুগ্ধাদি বিতরণ করিতেন |"

সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর Iswar Chandra Vidyasagar Story of his Life and Work (১৯০৭) গ্রন্থে 'Labour of Love in Burdwan' নামে একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন | তাতে লিখেছেন –

"He looked after the poor sufferers from hut to hut, and when he saw that the diseased person was too feeble to walk to the dispensary, he made the medical officer attend the patient at his own hut, and he himself carried the medicine for him. He thus saved numbers of poor people from imminent death, who, but for his kind care and charities would certainly have met with an untimely death."

মুসলমান পল্লীর কথা উল্লেখ না করলেও বর্ধমানে মহামারী পীড়িত আর্ত মানুষদের জন্য বিদ্যাসাগর কী করেছিলেন তা স্পষ্ট | বিহারীলাল সরকার লিখেছেন –

"১৮৬৮ সালে বর্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের সংহারমূর্তি দেখা দিয়াছিল | রোগে ত্রাহি ত্রাহি; কিন্তু চিকিৎসা করিবার লোক নাই |... স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় রোগীদের চিকিৎসার্থে 'ডিসপেনসারি' স্থাপন করিয়াছিলেন | ঔষধ পথ্যের যথারীতি ব্যবস্থা হইয়াছিল |... জাতিবর্ণ নির্বিশেষে পীড়িত ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডিসপেনসারি হইতে ঔষধ, পথ্য ও পয়সা পাইত | তিনি প্রায় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন |... যে সব রোগী ঔষধ লইবার জন্য ডিসপেনসারিতে আসিতে পারিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের বাড়িতে গিয়া স্বয়ং ঔষধ পথ্য দিয়া আসিতেন |"

উল্লেখ না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না মুসলমান পল্লীতে বাড়িতে বাড়িতে ঔষধ পথ্য বস্ত্র বিতরণ করার জন্য প্রভাবশালী সদাশয় মুসলমান স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁকে সহযোগিতা করতেন | গোলাম আসগর জায়েদীর পরিবার এ ব্যাপারে তাঁকে পূর্ণ সহায়তা দিয়েছিলেন, এই তথ্য নির্ভুল হওয়াই সম্ভব |

প্রসঙ্গের শেষে চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত বিবরণ একটু উদ্ধৃত করি | তিনি লিখেছেন –

"এই দীর্ঘকালব্যাপী সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরে বর্ধমানের অসংখ্য লোক যখন মৃত্যুমুখে পতিত, বিপন্ন ও শ্রীভ্রষ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দরিদ্রজনের দ্বারে দ্বারে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন | অনেকে দেখিয়াছেন, কৃশ ও রুগ্ন মুসলমান শিশুসন্তান তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে, কেহ বা আত্মচেষ্টায় তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার উপক্রম করিতেছে | কিন্তু তাহাতে তাঁহার উপবীত ও উপবীত পরিশোভিত দেহ অপবিত্র হয় নাই |"

অনেক সন্দিগ্ধ বিদ্যাসাগর-জিজ্ঞাসুর চিত্রপটে টাঙিয়ে রাখার মতো একটি ছবি চন্ডীচরণ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন | কার্মাটারে তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে মিলেছিলেন, বর্ধমানে মুসলমানদের সঙ্গে | বিদ্যাসাগর যেন রবীন্দ্রনাথের 'শুচি' কবিতার সেই রামানন্দ, যাঁর অন্তরে পৌঁছেছিল লোকস্থিতির বেড়া ভাঙার ডাক | শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা, জাতিবাদী দেশাচারের লক্ষণরেখা পেরিয়ে যেমন করে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নপুরুষ রামানন্দ একাকী বেরিয়েছিলেন পথে |

'রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী
মাথার ওপরে জাগে ধ্রুবতারা
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।'

পিছনে পড়ে রইল পণ্ডিত বংশের সুসংরক্ষিত ঐতিহ্য, বীরসিংহের পুরাতনী গ্রাম সমাজ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-মর্যাদা, নগর কলকাতার সাহেবি কেতা – বিদ্যাসাগর একা একাই বেরিয়ে পড়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো কবি নন, তিনি কর্মী। 'কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে'। আমরা জানি না কোনও কবীর তাঁকে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন কিনা –

প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি

তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন কিনা –

এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন।

কিন্তু বাংলা কাব্য কথিকায় রামানন্দ আসার আগেই তিনি বাস্তবে সে নাটক নিজের জীবনাচরণ দিয়ে সুসম্পন্ন করে গেছেন।

মুসলমান ভিক্ষুক –

যে সন্দিগ্ধ প্রশ্নের সুরাহা করার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা, তার জন্য আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ বোধহয় দরকার নেই। তবে অধিকন্তু না দোষায় সূত্র মেনে আরও দু-একজন সাক্ষী-সাবুদের কথা শোনা যেতেই পারে। প্রথমে আনি এক ভিক্ষুকের কথা। বিদ্যাসাগর তখন ফরাসডাঙায়, স্বাস্থ্য-প্রবাসে। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন –

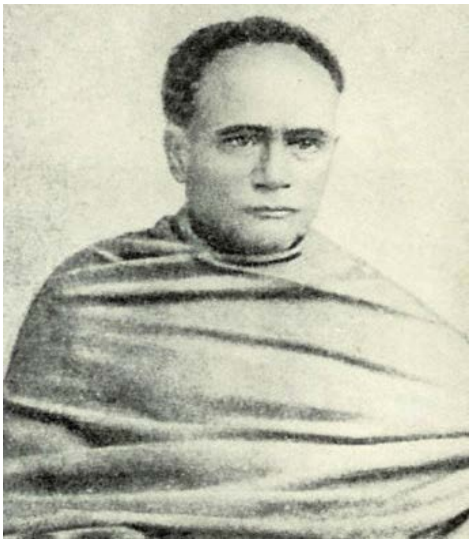

"একদিন একটি অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক স্ত্রীর হাত ধরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত শহর ঘুরিয়া একমুষ্টি ভিক্ষা মিলে নাই। শেষে সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার অবস্থা অবগত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে গোটাকতক পয়সা দিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'তোর কী খাইতে ইচ্ছা হয়?' ভিক্ষুক বলিল, 'আমি লুচি ও দই অনেকদিন খাই নাই। আমার এখন তাহা খাইতে ইচ্ছা হয়।'

বিদ্যাসাগর তখনই আপনার কন্যাকে দিয়া লুচি প্রস্তুত করাইয়া ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকের স্ত্রীকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দেন। অধিকন্তু তিনি তাহাকে দুইটি টাকা দিয়া বলেন, 'প্রত্যেক রবিবার আসিয়া লুচি খাইয়া যাস।' কেবল ইহাই নহে তাহাদের ঘরভাড়া স্বরূপ তিনি প্রত্যেক মাসে আট আনা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।"

আমার মনে হয় না এই অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক দম্পতিকে কেউ কোনদিন ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, তোর কী খাইতে ইচ্ছা হয়? ভিক্ষুকের আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কী? দুটো পয়সা দিয়ে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচে সকলে, না দিতে হলেই ভাল হয়। সেখানে বিদ্যাসাগর তার ইচ্ছের কথা শুনে মেয়েকে দিয়ে লুচি ভাজিয়ে পেট ভরিয়ে খাইয়েছেন। কখন? যখন অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে দু'মুঠো মুড়ি আর বেলের শুঁটো খেয়ে থাকতেন। ফি হপ্তায় তাকে লুচি খেয়ে যাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন এবং গল্প করতে করতে জেনে নিয়েছেন তার বাড়িভাড়া দেওয়ার সমস্যার কথা। সে সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও নিয়েছেন। এ বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব।

অখিলদ্দীন ফকির –

নিবন্ধ শেষ করি আর এক মোক্ষম সাক্ষীর কথা পেড়ে। সাক্ষীর নাম অখিলদ্দীন।

জীবনীকার চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন –

"তিনি একদিন কয়েকজন বন্ধুর সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে অখিলদ্দীন নামে এক অন্ধ ও খঞ্জ ফকির একটি গান করিতে করিতে যাইতেছিল। গানের প্রথম চরণ 'কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন' শুনিবামাত্র তিনি তাহাকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি আসিলে, তাহাকে বসাইয়া ঐ গানটি আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ প্রাণ ভরিয়া শুনিলেন। যতক্ষণ গান শুনিয়াছেন ততক্ষণ অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। গান শেষ হইলেও অনেকক্ষণ নীরবে সঙ্গীতজাত ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেই লোকটিকে বোধহয় আট আনা দিয়া বিদায় করিলেন এবং তাহাকে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিয়া

দিলেন।"

অখিলদ্দীন পরে বলেছেন –

"বিদ্দেসাগরবাবু আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন, আর এই গান শুনিয়া খুব খুশি হইতেন | তাহার নিকট অনেক পয়সা পাইয়াছি।"

জীবনীকার পরে অখিলদ্দীন ফকিরকে খুঁজে বের করে তাঁর কাছ থেকে পুরো গানটি লিখে নিয়েছেন। তাতে আছে –

'তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চড়নদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।'

এ হচ্ছে সন্ধ্যা ভাষায় গাওয়া সেই মরমিয়া গান যে গান বাঙালি চর্যাপদের আমল থেকে গাইছে | তার একদিকে ব্রাহ্মণ্য আচারবাদ অন্যদিকে ইসলামী শরিয়তি কঠোরতা | নানা অনুশাসন দিয়ে তাকে যতই আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ততই সেই বাঁধন টপকে সে এসে মিলেছে তার সহজিয়া, মরমিয়া মিলনবাদী আত্মানুসন্ধানী প্রাণের ধারায় | আউল (আকুল) বাউল (বাতুল), দরবেশি ফকির হয়ে সে মুছে ফেলেছে তার শাস্ত্র ও সমাজসিদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায় পরিচয়।

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জাতের কি রূপ
দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালায় কেউ তসবি গলায়,
তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়।
জাতের চিহ্ন রয় কার রে।'

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পরিবারের জাতক, সংস্কৃত শাস্ত্রপড়া পণ্ডিত, কিন্তু মানবজীবনের সত্য তিনি পাঠ করেছিলেন বাস্তবের কঠোর কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে | তাই আচারবাদী সম্প্রদায়নিষ্ঠ ধর্ম ও জাতিবাদ তাঁকে কোনদিন টানেনি। সেসব চিহ্নবাদী ধর্মের সীমানা তিনি নিঃশব্দে টপকে গেছেন | তাঁর কাছে পদ পরিচয় নয়, ধন পরিচয় নয়, ধর্ম পরিচয় নয়, জাতি পরিচয় নয়; বাস্তব মানুষ পরিচয়টাই বড় ছিল। তাই তাঁর কাছে হিন্দুও ছিল না, মুসলমানও ছিল না। তিনি এসেছিলেন বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকে আর অখিলদ্দীন ফকির এসেছিলেন লোকজীবনের আভ্যন্তর ব্যাকুলতা থেকে। অখিলদ্দীন প্রবেশ করেছিলেন ফানার মধ্যে। বিদ্যাসাগর তার সুরের আর্তি থেকে চিনে নিয়েছিলেন আপনজন হিসাবে। চিহ্ন পরিচয়ের সমস্ত ধর্মীয় অভিজ্ঞান থেকে মুক্ত করেছেন নিজেকে, কোনো বিশেষ প্রকোষ্ঠ পরিচয়ে নিজেকে বদ্ধ রাখেননি | অখিলদ্দীনের গানে আছে সেই পরিচয়চিহ্নহীন মুক্তির মর্মরিত ব্যাকুলতা | বিদ্যাসাগর অশ্রুসজল চোখে প্রাণভরে তাঁর গান শোনেন | দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, ভিক্ষাজীবী অসহায় মুসলমানের প্রতি দয়ালু অর্থবান এক উচ্চবর্ণ হিন্দুর করুণাবোধ থেকে তাঁর চোখের জল পড়েনি। বিদ্যাসাগরের ভিতরে বাঁধনছেঁড়া প্রাণের যে সাধনা কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে একটি মুক্ত অবস্থানে উত্তীর্ণ হয়েছিল অখিলদ্দীনের রহস্য মর্মরিত গানের সুরে তিনি শুনতে পেলেন তারই প্রতিধ্বনি। একই কক্ষে রাখা একটি তন্ত্রী বেজে উঠলে সম লয়ে বাঁধা অন্য একটি তন্ত্রীতে যেমন এসে লাগে তার কম্পন, বিদ্যাসাগরের চোখের জল সম লয়ে বাঁধা মনোবীণার অনুভাব (external symptom) বিশেষ।

ব্রায়ান হ্যাচার তাঁর বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত Vidyasagar: The Life and After-Life of an Eminent Indian গ্রন্থে পুরো একটি অধ্যায় অকারণ ব্যয় করেননি। তাঁর

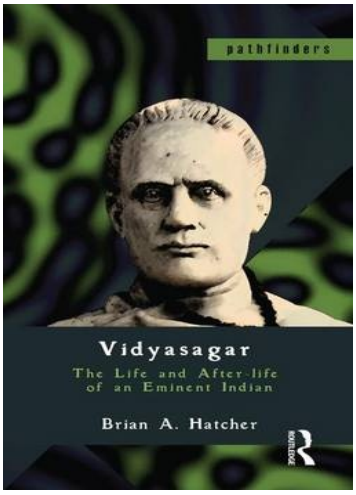

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'Akhiladdin's Song'। ২৫টি পৃষ্ঠা তিনি ব্যয় করেছেন এই গানের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় | হ্যাচারের সঙ্গে মতে না মিলতে পারে কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যায় অখিলদ্দীনের প্রসঙ্গ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে নির্ণয়ে ভুল নেই।

ইতালীয় রেনেসাঁসে হিউম্যানিস্টরা কেউ ধরেছিলেন 'Vita Activa'-র পথ, কেউ বা নিবিষ্ট হয়েছিলেন 'Vita

Contemplativa'-র মধ্যে। 'Vita Activa' বলে সক্রিয়তাই ধর্ম। আলবের্তি লিখেছিলেন, 'মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যত বেশি সম্ভব মানুষের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠা।' পেত্রাকা বলেছিলেন, নির্জনতা ছাড়া মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে পারবে না। 'If you have yourself, that is enough'। বিদ্যাসাগর ভিতা আকতিভার পথিক। সারাটা জীবন ব্যয়

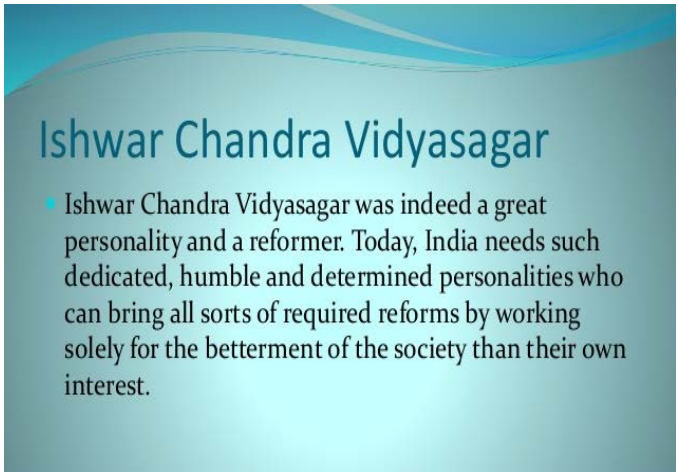

করেছেন অন্যের কল্যাণকর্মে। কিন্তু আত্ম-অনুশীলনের অনুন্মোচিত ব্যাকুলতা কি ছিল না তাঁর মনে? অখিলদ্দীনের গান শুনে জেগে উঠেছে তাঁর ভিতরের তৃষিত ভিতা কনতেমপ্লাতিভার নিভৃত অন্তঃসত্ত্বা। তিনি এক পথ দিয়ে যান, অন্য পথে যান অখিলদ্দীন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দুজনের। অখিলদ্দীনের গান শুনে তাঁর ভিতরের পাখি ডানা ঝাপটে উঠেছে –

'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়
আমার ঘরে থাকাই দায়'

পথ থেকে তাঁকে ডেকে আনান। তাঁর গান শোনেন। গান শুনে বিভোর হয়ে বসে থাকেন। বাঁধাছকের ধর্ম দিয়ে এর ব্যাখ্যা হবে না। কেউ কেউ একে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরানুরাগের প্রমাণ হিসাবে দাখিল করেছেন। ঈশ্বরের জন্য তাঁর ভিতরে যে আসন পাতা ছিল, এ নাকি তাঁর 'অনস্বীকার্য প্রমাণ'। ধর্মের সমস্ত শাস্ত্রীয় ও সামাজিক আঁট বাঁধুনি ভেঙে যে মানুষ খুঁজে ফিরছেন আপন মুক্তির পথ, অখিলদ্দীন সেই বাউল-ফকির। বিদ্যাসাগর সেই ফকিরের মধ্যে দেখেছেন আপন মুক্তি-যাত্রারই প্রতিরূপ।

'যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়'

বলবেন কী করে? কী ভাষায়? কেন? – অশ্রুর ভাষায়। অশ্রুই তাঁর হৃদয়ের অক্ষর।

'যতক্ষণ গান শুনিয়াছেন, ততক্ষণ অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন।'

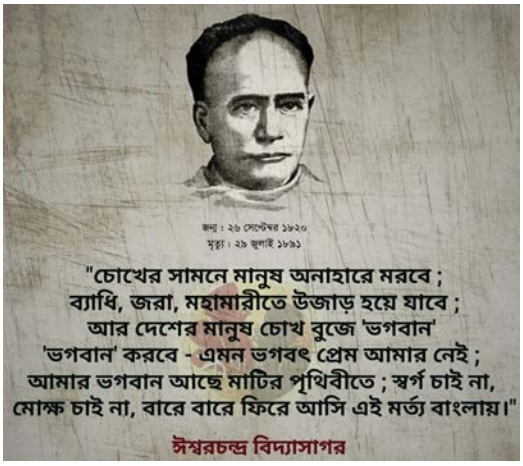

দীনের সদা বন্ধু যে জন
বন্ধুতার প্রতীক বিদ্যাসাগর

সুমিতা বসু

এই মারণ রোগে মানুষ বড় অসহায়। উপায়? বন্ধু চাই।

জানেন তো মশাই, সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহে এক মারাত্মক অসুখ এসেছে গত দেড় বছর। এই তৃতীয় গ্রহ অর্থাৎ সারা পৃথিবী জুড়ে মহামারীর নাম, 'করোনা'। কতদিন যে এ ভয়ংকর অবস্থা চলবে, কে জানে! এ যেন অদৃশ্য কোনো আততায়ী মানব-বংশকে নির্মূল করার ধ্বংস নেশায় মেতেছে, যেমন আদি পুঁথিগুলোতে লেখা ছিল কালী রুদ্রাণীর করালবদনীর প্রলয়লীলা, ঠিক যেন সেইরকম! এ যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকেও ধ্বংসাত্মক মৃত্যুর মিছিল। উপায় কী বাঁচার? উপায় কী, একটু আশার আলো দেখার? সব সম্পর্কের টানই যদি এখন ওলটপালট, কোন সম্পর্কের ওপর ভর দিয়ে মনুষ্য সমাজ একটু মাথা তুলে দাঁড়াবে? একা জেতার নয় এই যুদ্ধ। তাই, 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'ই একমাত্র মন্ত্র সমগ্র মানব জাতির। কিন্তু বেঁধে বেঁধে থাকলেও শারীরিক কাছে যাওয়ার উপায় নেই একেবারে, এ থাকা দূরে দূরে থেকে বেঁধে বেঁধে থাকা। ওই 'খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না'-র মতো আরকি! এরই মধ্যে অজস্র স্বেচ্ছাসেবক দল বন্ধুতার হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসুস্থ শরণাগত দীনার্ত মানুষগুলির পাশে। আসলে বিপদের দিনেই বেরিয়ে আসে মানুষের আসল দেবত্বময় রূপ, তাই হাত বাড়ালেই বন্ধু।

আরে দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই, বন্ধু বললেন না? ওই শব্দটাই যাদুময়। এক অপরূপ মায়াবন্ধনে বাঁধা বলেই তো বন্ধু। বন্ধুতার মধ্যে প্রেমের যে প্রকাশ তা শারীরিক মানসিক ভাবের ঊর্ধ্বে, কালোত্তীর্ণ, যুগোত্তীর্ণ। বন্ধু – আহা, কত আদরের নামেই না তাকে ডাকি – মিত্র, সুহৃদ, সখা। রক্তের চেয়েও দামী এই সম্পর্ক, অথচ কী নির্মল, পবিত্র, নিষ্পাপ আর প্রত্যাশাবিহীন। সবাই পারে না এই বিশুদ্ধ সম্পর্কের দীপটি জ্বালিয়ে রাখতে, নিঃস্বার্থভাবে বন্ধুর হাতে হাত রাখতে। কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে কেউ কেউ পেরেছিলেন। বালি সুগ্রীবের যুদ্ধে রামচন্দ্রকে দেখেছি পরম বন্ধুর ভূমিকায়। দেখেছি শ্রীকৃষ্ণকে। বৃন্দাবনে রাধিকা যাঁর প্রেমে পাগল, গোপীকুল তাঁকেই সখা মাধব মাধব করে অস্থির। হস্তিনাপুরের প্রকাশ্য রাজসভায় সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিতা নাথবতী অনাথবৎ দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের আকুল ডাকেও সেই সখা কৃষ্ণই ছিলেন একমাত্র সহায়।

আপনারা বলতে পারেন, এগুলো তো পুরাণের গল্পকথা, কিন্তু এরকম একজনকে আমরাও খুব কাছ থেকেই দেখেছি। বাংলার নবজাগরণের সময় বাঙালিও পরম সৌভাগ্যে এমনই এক দীনের বন্ধু পেয়েছিল। করুণার সিন্ধু তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কার বন্ধু না তিনি! সমগ্র বাঙালি জাতি প্রতি মুহূর্তে তাঁরই বন্ধুতার অঙ্গীকারে ঋণবদ্ধ। আর বাঙালি মা / মেয়েদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আজ তাঁরই বন্ধুতার একটু কথা বলতে চাই। বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বের দায়বদ্ধতায় যে মানুষটি ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড উপকৃত আর তাঁরই জন্য আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এত সমৃদ্ধ, সেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লিখেছিলেন –

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে...

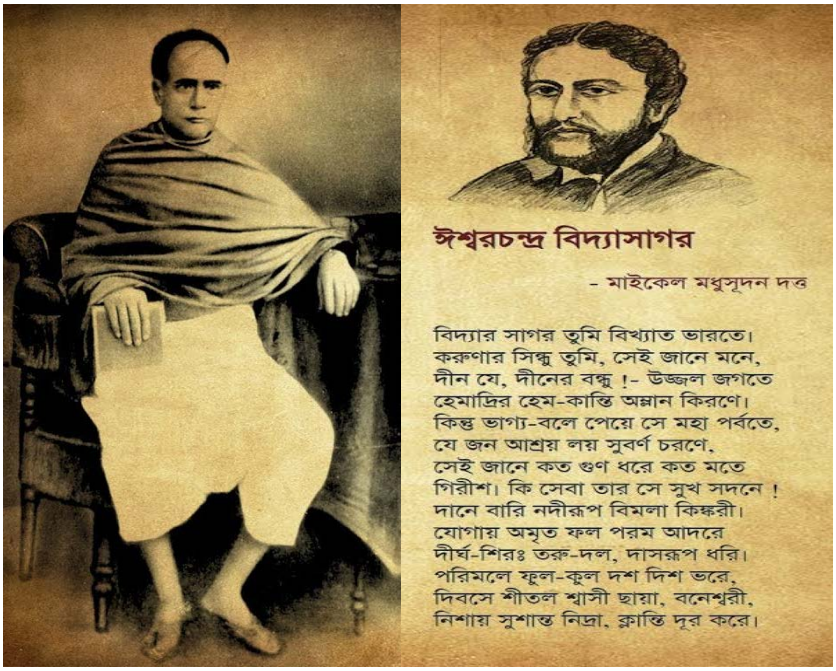

বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপনে বরেণ্য মানুষটির মনের ভেতরের চিরকালীন মায়ের মমত্ব, সুজন বন্ধুর অকৃত্রিম হৃদয়ের স্পর্শটুকু তুলে ধরতে চাই এই লেখায়। তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কাজের তালিকা তো ছিল বিশাল। মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কারে লিপ্ত বাঙালি সমাজকে তিনিই দেখিয়েছিলেন সভ্যতার আলো, সর্ব অর্থে। প্রকৃত এই বন্ধুটির প্রতি বাঙালি মেয়ে হিসেবে আমার অকুণ্ঠ ঋণ।

অবলা অসহায় নারীর বন্ধু

কী ছিল সেই সমাজ, আজও ভাবলে গা শিউরে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা সবে বন্ধ হয়েছে। ঘরে ঘরে বিধবা শিশু কন্যাদের মেলা। বিদ্যাসাগরের নিরলস উদ্যোগ – বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, শিক্ষা সম্প্রসারণ বিশেষত নারী শিক্ষা প্রচলন, তদানীন্তন সমাজকে অগ্রগতির পথ দেখাল। লক্ষ্যণীয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে তাকে তক্ষুণি আইনসিদ্ধ তিনি করতে পারেননি ঠিকই কিন্তু বারবার মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে নানাবিধ যুক্তি দেখিয়ে এই বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আজীবন প্রচার চালিয়ে গেছেন ধর্ম নিরপেক্ষভাবে। নিজের বয়স্ক ও শ্রদ্ধেয় এক শিক্ষককে মাত্র পনেরো বছরের বালিকাকে বিবাহ করতে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "এ জন্মে আর মুখ দেখব না আপনার।"
এ কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছিলেন।

অবিভক্ত বাংলা তখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার মাথার মুকুটের মধ্যমণি। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমর্থকদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় শিশু কন্যাদের বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত সচেনতনতা এলেও বিধি নিষেধের পাকাপাকি গন্ডি কিন্তু তখনও স্থাপিত হয়নি। এমনকি Age of Consent Act আইন হিসেবে এল অনেক পরে, ১৯শে মার্চ ১৮৯১ সালে। এটিও কলকাতার ১৮৮৯ সালে এগারো বছরের ফুলমণি দাসীর ওপর তার পঁয়ত্রিশ বছরের স্বামী হরিমোহন মাইতির ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এসব এমনি এমনি রাতারাতি হয় না, এর প্রস্তুতি পর্ব কিন্তু বাঙালির পরম বন্ধু বিদ্যাসাগর বহুদিন ধরেই করে যাচ্ছিলেন।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ১৮৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা", বিদ্যাসাগরের এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বিরোধিতার ঝড় উঠল। প্যামফ্লেটে প্যামফ্লেটে ছেয়ে গিয়েছিল কলকাতা শহর, এছাড়া হুমকি, ভয়, আক্রমণ, ধিক্কার। অনেক বরেণ্য মানুষ – যেমন প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাধানাথ শিকদার, দীনবন্ধু মিত্র ও আরো অনেকে প্রথমে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পরে আবার বিদ্যাসাগরকে সমর্থনও করেছেন। বিদ্যাসাগর যথার্থই ছিলেন বাঙালি মা / মেয়ের পরম বন্ধু। বন্ধুই তো, নাহলে অবলা অসহায় প্রায় শিশু মেয়েদের জন্য এত প্রাণ কাঁদে কারো? ভাই শম্ভুচন্দ্রকে এক চিঠিতে পরে লিখেছিলেন বিধবা বিবাহকেই জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে তিনি মনে করছেন। শহর কলকাতায় এই বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত টালমাটাল অবস্থা একটু স্থিত হ'ল ক্রমশ। হতেই হবে কারণ দীনের প্রকৃত বন্ধু বিদ্যাসাগর তো হার মানার পাত্র নন। এরপর শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলেও বিধবা বিবাহ হতে লাগল। শোনা যায় তখনকার দিনে মোটামুটিভাবে

এই বিধবা বিবাহ খাতে তাঁর খরচ হয়েছিল ৮০,০০০ টাকারও বেশি। নিজে সব ব্যবস্থা করা ছাড়াও উচ্চ পণ দিয়েছেন, দিয়েছেন টাকা, জিনিস, গহনা সবকিছু – নিজের থেকেই। সালংকারা বধূর লোভেও অনেকে বিধবা বিবাহ করেছিলেন। এটাও শোনা যায় যে, বিধবা বিবাহের পরও বউকে ছেড়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হতো। ঐসব পরিবারগুলির নিরাপত্তার দায়িত্বও তাঁকে নিতে হচ্ছিল। শিশুকন্যা বা সদ্য তরুণী বিধবা মেয়েদের জন্য বাপেরবাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি কোনোটাই তেমন নিরাপদ ছিল না। সাংসারিক পরিশ্রম ছাড়াও বাড়ির মধ্যেই ধর্ষণ ও বলাৎকার ছিল নিত্য ঘটনা। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত

হইলে, অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক...”

সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্টের মধ্যে বিধবা বিবাহকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এইবার তিনি ভাল করেই অনুভব করলেন। Hindu Widows' Remarriage Act, 1856, (Act XV, 1856) আইনসিদ্ধ হ'ল ২৬শে জুলাই ১৮৫৬ সালে। আর লোভ, মাৎসর্য, হিংসা ইত্যাদি ষড়রিপুর প্রকোপেই তো চলে সাধারণ মানব সমাজ, তাই সম্পত্তির ব্যাপারটাও যাতে সর্বনাশের কারণ না হয়, লিখিতভাবে তা পাকাপাকি করা হ'ল। আইনিভাবে বলা হ'ল –

“….a widow shall not by reason of her remarriage forfeit any property or any right to which she would otherwise be entitled, and every widow, who has re-married shall have the same rights of inheritance as she would have had, had such marriage been her first marriage.”

নারীশিক্ষা বিস্তারে এক অক্লান্ত বন্ধু

মেয়েরা পড়াশোনা করলে যে সমাজেরই সর্বাঙ্গীন উন্নতি একথা স্বার্থপর সুবিধাবাদী আপাত শক্তিশালী ‘আপনি মোড়ল’ গোছের লোকেদের মাথায় ঢুকত না। অথবা তারা ঢোকাতে চাইত না নিজেদের ক্ষমতার লোভে। সে যাই হোক, বাঙালির প্রকৃত বন্ধু অকুতোভয় বিদ্যাসাগরকে এসব কথায় দাবিয়ে রাখা যাবে না। নিজেই রাত জেগে জেগে লিখতে লাগলেন পাঠক্রমের বই। একটার পর একটা। এক কথায়, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ছিল ত্রুটিহীন।

তিনি জানতেন একমাত্র নারীই সমাজকে এই দুর্দান্ত কুসংস্কার থেকে টেনে বার করতে পারবে, আর পারবে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত, প্রকৃত শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত করতে। তাই চলতে লাগল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। নিজেই টাকা ধার নিয়ে পরপর ১০০টির অধিক বাংলা স্কুল স্থাপন করে ফেললেন। পাশাপাশি সারা বাংলা জুড়ে স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায় সম্পর্কিত অজস্র লেখা আর চর্চা চলতে থাকে, কিন্তু খর্বাকৃতি এই পন্ডিতের উৎসাহ উদ্দীপনা ও উদ্যোগের কাছে তা অকিঞ্চিৎকর। “কর্মণ্যে বাধিকারস্তে” দীক্ষিত বিদ্যাসাগর কারুর কথায় কানই দিলেন না। উপরন্তু অসীম শক্তিতে, ওই অন্ধকারে মুখ ঢাকা সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও মেয়েদের স্কুল স্থাপন করতে থাকলেন নিজের খরচেই। ১৮৪৯ সালে কলকাতায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন সাহেবের সহযোগিতায় ‘হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়’ (বর্তমান বেথুন স্কুল) স্থাপন করা হ'ল, যা তৎকালীন সকলের সামনে নারী শিক্ষার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক বাধায় নিজের পরিবারের মেয়েদের শিক্ষিত না করতে পারলেও, উচ্চ শিক্ষাভিলাষী প্রতিটি মেয়ের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, গর্ব ও সমর্থন। কথিত আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৬ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু যখন প্রথম এম এ পাশ করেন, বিদ্যাসাগর প্রকৃত বন্ধুত্বের স্বাক্ষর হিসেবে স্বয়ং তাঁকে একটি সচিত্র শেক্সপীয়র সমগ্র উপহার দিয়ে স্বহস্তে লিখেছিলেন –

To Srimati Chandramukhi Basu, The First Bengali Lady who has obtained the Degree of Master of Arts of the Calcutta University from her sincere well-wisher Iswar Chandra Sharma.

পরিবারের সঙ্গে অপ্রিয় সম্পর্ক হওয়ায় বিদ্যাসাগর তাঁর শেষ জীবন কার্মাটারে বাস করতেন। আদিবাসী মেয়েদের জন্য, মানুষের উপকারের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই বন্ধুটি আজ থেকে কতদিন আগে কার্মাটারে আদিবাসী মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই যে, দীন যে দীনের বন্ধু।

আর এক বিশেষ বন্ধুতা

বন্ধুতা এক অমূল্য অনুভূতি যা সম্পর্কের বাজারে কেনা যায় না, এমনকি হিসেবের বিনিময়েও না। এ দেওয়া

নেওয়া আপেক্ষিক নয়, আন্তরিক ও প্রত্যাশাবিহীন। এবারে দুই মনীষীর বন্ধুতার একটু আভাস দেওয়া যাক।

মধুসূদন দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। মাইকেল হয়তো একজন উচ্ছৃঙ্খল অমিতব্যয়ী মানুষই থেকে যেতেন, যদি না বিদ্যাসাগর তাঁকে নিজের ছায়ায় না টানতেন। তাঁরই লেখা – "অবোধ আমি! অবহেলা করি" ছিল মধুসূদনের আসল পরিচয় | বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্বের প্রসন্ন হাত তাঁকে 'মধুসূদন দত্ত' করে বাংলা ও বাঙালিকে উপহার দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য পেয়েছে শর্মিষ্ঠা, তিলোত্তমা সম্ভব, মেঘনাদবধ কাব্য, বাংলায় সনেট ও চতুর্দশ কবিতাবলীর মতো সমৃদ্ধ সাহিত্য।

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি; –
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে –
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

মধুসূদন তখন শুধুই মাইকেল | ফ্রান্সের ভার্সাই-এ থাকাকালীন অর্থকষ্ট যখন আকাশচুম্বী, তখনই মনে পড়ল, হয়তো বিশেষ একজন তাঁকে বাঁচাতে পারে। অবশ্যই বাঙালি দীনের প্রকৃত বন্ধু বলতে সারা বাংলা জুড়ে একজনই | বিদ্যাসাগর। মধুসূদন-বিদ্যাসাগরের সরাসরি যোগাযোগটা কিন্তু শুরু হয়েছিল আর পাঁচজনের মতোই – বাংলার এক অসামান্য বন্ধুর কাছে বিপন্ন একজন মানুষের বিদেশে বসে প্রচন্ড আর্থিক বিপদে সাহায্য চাওয়া। মধুসূদন একেবারে ঠিক মানুষটিকেই যোগাযোগ করেছিলেন। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের এই চিঠিপত্র ইংরিজিতে লেখা, মধুসূদনের লেখাগুলি তাঁর Michael's Collected Works-এ পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিঠির নিশানা ঠিকমতো পাওয়া যায়নি। প্রথমদিকে দুজনের সামান্য পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠতা বিশেষ ছিল না, তাই "Sir" বলে সম্বোধন।

My dear Sir,

You will be startled, I am sure, grieved to learn, that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart, and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher. * * *

I am going to a French jail, and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution though I have fairly 4,000 Rupees due to me in India.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which I have been brought, and in this you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.

Shall I apologise for the trouble I am giving you? I do not think so; for I know you well

enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God, and you under God, help me to do so.

I am, my dear Sir,
Ever yours faithfully
(Sd.) Michael M. Dutt

France, Versailles, 12, Rue Des Chantiers, 2nd June, 1864

মনে রাখতে হবে সে সময়ের কথা | আরও মনে রাখতে হবে যে টাকাটা যাচ্ছে পরাধীন গরীব ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপের ফ্রান্সে | পাঠাচ্ছেন এক সংস্কৃত পন্ডিত একজন ইয়ং-বেঙ্গল প্রতিভাবান ইংরেজি ভাষায় ও কায়দায় কেতা দুরস্ত সাহেবি ভদ্রলোককে | বিদ্যাসাগরের তখন একান্ত আশা মধুসূদন সসম্মানে ইউরোপ থেকে ব্যারিস্টারি শেষ করে দেশে ফিরে প্রাক্টিস করবেন এবং তাঁর কাব্য প্রতিভাও বিকশিত হবে | এই চিঠি পেয়ে বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে ধার-দেনা করে সাধ্যাতীত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন | প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, মধুসূদনের পরবর্তী চিঠির সম্বোধন তাই বন্ধু –

My Dear Friend,

On the morning of last Sunday, the 28th Ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears in her eyes, and said - "the children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs. Why do those people in India treat us this way? I said –The mail will be in to-day, and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother." I was right; an hour afterwards I received your letter and the 1500 Rupees you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, and my great friend? You have saved me. * * *

Am I not right in thinking that you have the heart of a Bengali mother?

Yours (Sd.) Michael M. Dutt

অমিতব্যয়িতাই ছিল মধুসূদনের স্বভাব | তাই নিয়ত সাংসারিক আর্থিক প্রয়োজনের দাঁড়িপাল্লায় অভাবটাই স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর | আর তার যোগান দিতে সকলের থেকে কটুবাক্য শুনেও নিত্যদিন বিদ্যাসাগরকে তাল দিতে হয়েছে | এটাই তো একজন সত্যিকারের বন্ধু আর একজনের জন্য করে থাকে | উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল মধুসূদনের মধ্যে বিদ্যাসাগর এই ঊষাতেই দেখেছিলেন দুর্দান্ত প্রতিভার সূর্যোদয় | মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের চিঠির সংখ্যা অনেক, পরবর্তী চিঠিটি অনুকূল আর্থিক সাহায্যের প্রমাণস্বরূপ নীচে লিপিবদ্ধ করছি |

My dear friend,

Your kind letter with a draft for 2490 Francs reached me in due course and in very good time too; for we were without money and eagerly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little. * * *

(Sd.) Michael M. Dutt

ব্যারিস্টার হয়ে মধুসূদন ফিরে এসেছিলেন ঠিকই, তারপর বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় কাব্য সরস্বতীর সাধনাও করেছিলেন বাংলাতেই | বাংলা সাহিত্য উপহার পেল অসাধারণ বৈদূর্য মণিমাণিক্য | কিন্তু অভাবে স্বভাবসিদ্ধ কবির দেনাভার কাটেনি কোনোদিনও | বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর বারম্বার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন | শুধু তো এক মধুসূদন নন, সাহায্যের ডাক তাঁর কাছে আসে দশদিক থেকে | দায়বদ্ধতা বাড়তেই থাকে | সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নিজেরই ধার দেনার অঙ্ক বাড়তে বাড়তে আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে | বিপদের দিনেই তো চেনা যায় ভেতরের মানুষটিকে | সুজন বন্ধুত্বের এই তো দেওয়া নেওয়া | এই সময় মধুসূদন এসে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগরের পাশে |

বাঙালির ইতিহাসে বিদ্যাসাগরকে আমরা নব জাগরণের পথিকৃৎ, সমাজ সংস্কারক, বিধবা বিবাহ প্রবর্তক, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির কর্ণধার এবং আর যাই বলি না কেন, তিনি যে সর্ব অর্থে ছিলেন এক প্রকৃত বিশিষ্ট সুহৃদ এটাই বুঝি তাঁর সব থেকে বড় পরিচয়। এসব ছাড়াও বিদ্যাসাগরের দয়ার, ভালবাসার, করুণার সাগরের মতো অনন্ত পরিব্যাপ্তির কথা আমরা সকলেই জানি। জানি ১৮৬৮-৮৯ সালের 'বর্ধমান ফিভার'-এর সময় দুঃস্থ অসুস্থ মানুষগুলোর পাশে থাকা ও

তাদের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। অতিমারীর মোকাবিলা করার জন্য বাড়িভাড়া করে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করার কথা। জাতি-বংশ-ধর্ম নির্বিশেষে দীন দরিদ্রের কুটিরে কুটিরে গিয়ে নিজে হাতে ওষুধ পথ্য বিলি করার কথা। এগুলো তো বন্ধুই করতে পারে বন্ধুর জন্য।

২০১৯ থেকে আজ ২০২১-এও আমাদের এই সারা পৃথিবী যখন প্রবল ভয়ানক এক বিশ্বমারীর কবলে, আমরা শুধু এখন বন্ধু চাই, ভাল থাকার একটাই সম্পর্ক। দু'হাত তুলে আকাশ পানে চেয়ে ডাকি তাঁকেই, কোথায় তুমি দীনের বন্ধু, শক্তি দাও আমাদের এই যুদ্ধে আরো বেঁধে বেঁধে থেকে যেন জিতে যেতে পারি।

সম-অসম-সুসম বন্ধুতারই আরেক নাম করুণার সাগর বিদ্যাসাগর।

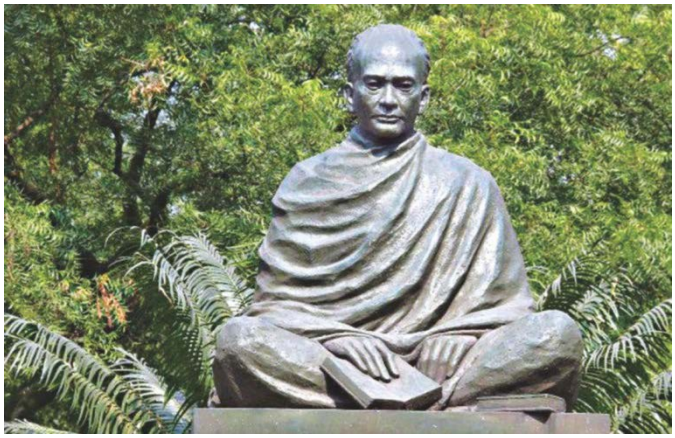

সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম

প্রবাস বন্ধু

বিশেষ সংখ্যা ১৪২৮ (2021)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। ওয়ার্ড-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

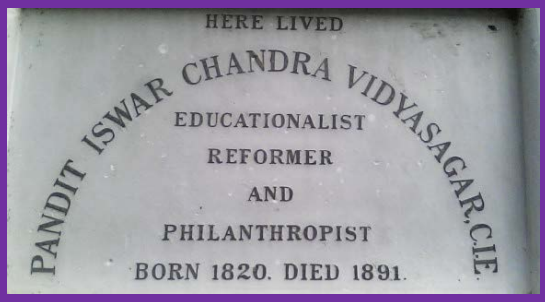

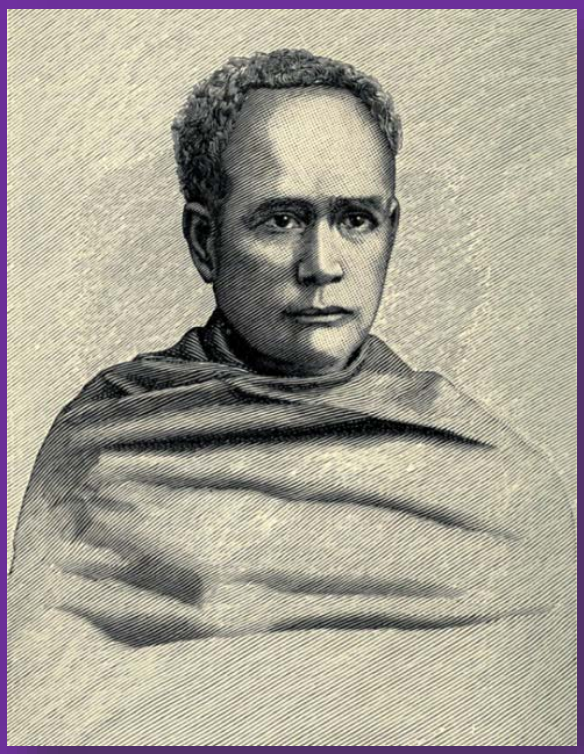

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ১৯৬৯ সালে স্থাপিত নেতাজীর স্ট্যাচু